অরণ্য আদিম

অরণ্য আদিম

রমাপদ চৌধুরী

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

'অরণ্য আদিম' প্রকাশ করতে গিয়ে একটু সঙ্কোচ বোধ করছি। একদিক থেকে এটি আমার প্রথম উপন্যাস। বিশেষ করে এই পর্বটি একেবারে সাহিত্য প্রচেষ্টার প্রথম যুগের রচনা। মূল উপন্যাসটি চারটি পর্বে বিভক্ত ; অর্থাৎ এ পর্বটি মূল কাহিনীর ভূমিকা, মূল উপন্যাসের পশ্চাৎপট। এটি প্রকাশ করতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতে ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু বিরত হয়েছি এই কারণে যে সংশোধনের পর এটি একটি সম্পূর্ণ নতুন উপন্যাস হয়ে দাঁড়াতো। আঙ্গিকের দিক থেকে তা হয়তো আরো সুন্দর হতো, আরো সুখপাঠ্য ; কিন্তু অল্প বয়সের সে উত্তাপ হয়তো মুছে যেতো এ বইয়ের পাতা থেকে।

সঙ্কোচ বোধ করছি, আরো একটি কারণে। আজকের দিনের অধিকাংশ পাঠকেরই ধৈর্য সীমিত। কাহিনীর রুদ্ধনিশ্বাস আকর্ষণ নেই বলেই ডস্টয়েভস্কি বা প্রুস্তের উপন্যাসেরও পাঠক যেখানে মুষ্টিমেয় সেখানে 'অরণ্য আদিমে'র মত ধীরগতি রচনা হয়তো পাঠকদের প্রিয় হবে না। তবে আশার কথা, এ যুগের এ অস্থিরতা ও ধৈর্য্যভাব চিরকাল নিশ্চয়ই থাকবে না।

র. চ.

এই লেখকের

লালবাই

প্রথম প্রহর

দরবারী

পিয়াপসন্দ্

আপন প্রিয়

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

বাংলার পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে যে পাহাড়, অরণ্য আর লাল মাটির বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড দক্ষিণের বাদামপাহাড় বড়জামদা থেকে রাজ-খার্সান তিরুল্‌ডি তোরাং হয়ে নামকুম রাঁচি ইট্‌কি লোহারডাগার দিকে প্রসারিত, আবার উত্তরে বরলঙ্গা সোন্‌ডিমরা রামগড় এবং ভুরকুণ্ডা পরিক্রম করে যে-সীমারেখা পাত্‌রাতু মহুয়ামিলন লাতে-হারের নীলাভ পার্বত্য অরণ্যের তরঙ্গে তরঙ্গে পরিব্যাপ্ত, সে-অঞ্চলে তখনও রেললাইন দেখা দেয় নি।

সভ্য মানুষের পৃথিবীতে তখন উনবিংশ আর বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে যন্ত্রযুগের অভিনন্দন-শঙ্খ বেজে উঠেছে। ভারতবর্ষের আকাশে তখন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে মোগল রাত্রির শেষ শুকতারা, পাশ্চাত্যের যন্ত্রমূর্ছনার কাছে ম্লান হয়ে গেছে হারেমের রূপকণ্ঠীর সুরগুঞ্জন। শোষণ-শাসনের খরস্রোতের অন্তরালে দেখা দিয়েছে এক নতুন জাগরণ।

অথচ, সেই সময়ে মাত্র কয়েক শত মাইলের ব্যবধানে বাংলার পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে যে বিস্তৃত মৃত্তিকার সমুদ্রে পাহাড়ী তরঙ্গের সারি চলে গেছে রামগড় আরগাডা হয়ে খালারি লাতেহারের দিকে, সেখানে তখনও বহির্জগতের কোনো আলো এসে পৌঁছয় নি, সভ্যতার সব স্রোত উপেক্ষা করে আদিম আরণ্যক রীতিতে পুরোনো পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখছে একদল মানুষ। লক্ষ লক্ষ বনচারী তখনও দেশলাই, খবরের কাগজ, ইলেকট্রিকের আলো দেখে নি। সিল্লি, তামাড়, বুণ্ডু, বরণ্ড, রাহে—এই পাঁচ পরগনার অরণ্যবাসীরা তখনও রেললাইন দেখে নি। মুখের রঙ হাতের চিহ্ন দিয়ে কাগজে কলমে লেখা যায় জানতো না তারা।

শুধু পাহাড় আর বন আর নদী চিনতো, চিনতো নিজেদের দল।
মানতো, মাথা নোয়াতো পাঁচ-গাঁওয়ের সর্দার মান্‌কির কাছে।
তখনও এ-অঞ্চলে রেললাইন আসে নি, দেশলাই—খবরের কাগজ
—ইলেকট্রিকের আলো দেখে নি তারা।

লাপরার লাল মাটি তখনও অক্ষত কুমারী, বালির পাহাড়
'বুরু গিতিলে' মানুষের পদক্ষেপ ঘটে নি, গাড়ার জলে 'কারাকোম'
নির্ভয়ে বাস করতো, ডাঙার শত্রু মানুষকে চিনতে শেখে নি তখনও।

শত শত ক্রোশ শুধু পাহাড়ের ঢেউ, মাঝে মাঝে কয়েক বিঘে
সবুজ উপত্যকা, কোথাও বা হঠাৎ-পাওয়া জল-ছলছল নদী, আর
সবকিছু ঢেকে ঘন অরণ্যের বিভীষিকা। ঘন বনের বীভৎস
অন্ধকারে কখনও হয়তো দপ্‌দপ্‌ করে আলেয়া জ্বলে ওঠে, নদীর
কিনারে বাঘের থাবা ছাপ রেখে যায়, মহুয়ার গুঁড়িতে ভালুকের
লোম, আর ঝর্ণার স্রোতে বিশালকায় কোনো পাহাড়ী সাপের
খোলস ভেসে আসে। চন্দ্রবোড়ার বিষ-নিশ্বাস, চিতাবাঘের
চিৎকার, কিংবা ক্ষিপ্ত গোঁয়ারের ক্ষুরের শব্দে ভয়ে মুখ লুকোয়
বুনো খরগোস, ঝাঁক-ঝাঁক শঙ্খ তিতির আকাশে উড়ে পালায়।
শহুরে মানুষ কল্পনার চোখে এ প্রাগৈতিহাসিক অরণ্যের ছবি
দেখে, কখনও বা সন্দেহ খেলে যায় তার মনে। ভাবে, সত্যিই কি
এমন কোনো যুগ ছিলো এই ভারতবর্ষে? সেদিন এখানে লোভের
ইশারা দেখতে পায় নি সভ্য মানুষ, তাই খোঁজ রাখে নি, লক্ষ লক্ষ
'অনার্য' প্রতিবেশী কি-ভাবে সময়কে স্তব্ধ করে বুনো মানুষের
জীবনকে বাঁচিয়ে রাখছে যুগ যুগ ধরে।

পাঁচ পরগনার অধিবাসীরাও খোঁজ রাখতো না শহর-সভ্যতার।
খাজনা কাকে বলে জানতো না তারা। জঙ্গল সাফ করে, পাথুরে
মাটিকে ভেঙে নরম করে ধান আর জনারের চাষ দিয়ে আসছিলো
সিল্লি তামাড় বুণ্ডু বরণ্ড রাহে—এই পাঁচ পরগনার পাহাড়ী
উপত্যকায়।

সেরমা চাঁদোর দেওয়া মাটি জল বাতাস, গতরের ঘাম দিয়ে চাষ করছিলো এতোদিন। হাজারো বছরের সংস্কার বলতো, লাঙলের ফলায় মাটির কৌমার্য ভাঙা পাপ। রোপাই নয়, ছড়ানো বীজের ঝুম-ফসলকে ভাবতো চাঁদো বোঙার আশীর্বাদ। চকমকি ঠুকে বুড়ামবুড়া আর বুড়ামবুড়ির দেওয়া আগুন জ্বালতো, বনমোরগ পোড়াতো জুয়াংরা। মুণ্ডা বীরহর্ দলের সাওতী পুরুষরা আপন আপন ঠিগিয়া মেয়ের সঙ্গে নাচতো গাইতো সেঙ্গেল আগুন ঘিরে, আর তুম্‌দা মাদল বাজতো ডুম-ডুম ডুম-ডুম, তিরগিয় বাঁশীর সুর কাঁপতো তিরিরিরি তিরিরিরি।

এমন সময় হঠাৎ একদিন বন কাঁপিয়ে আওয়াজ এলো ঝুমুর-ঝুম ঝুমুর-ঝুম।

ভয়ে বিস্ময়ে ছুটে এলো ওরা।

দেখলে, হাতিয়ার নিয়ে ঘোড়ায় চেপে ক-জন সিপাই সান্ত্রী বরকন্দাজ। মাঝখানে বারো বেহারার ডুলী-পালকিতে চেপে এসেছে কে একজন।

ডুলি থেকে নামলো সে।

বললে, খাজনা চাই।

বললে, রাজার জমি চাষ করতে হলে খাজনা দিতে হবে।

খাজনা? আকাশ থেকে পড়লো ওঁরাও আর মুণ্ডার দল।

মালগুজারি জিনিসটা কি বটে, মালগুজারি বাবুটাই বা কে বটেন! সিঞ বোঙার দেওয়া মাটি জল, বুড়াবুড়ির দেওয়া মাটি জল, চাষ করে ফসল ফলায় শরীরের রক্ত রোদে তাতিয়ে ঘাম ঝরিয়ে। জমি জল তো সেরমা চাঁদোর, পাঁচ পরবে পুজো দেয় তার, মোরগ বলি দেয়, সোকথাইন হয় মেয়েরা। আবার কিসের মালগুজারি!

মালগুজারিবাবু হাসলো ওদের কথা শুনে।

দেবতাই দিয়েছেন বটে সব, কিন্তু তিনিই আবার পাঠিয়েছেন রাজা, উজীর, পাঁচ পরগনার মানুষকে বিপদে-আপদে রক্ষা করতে।

কথাটা বুঝলো না কেউ। পানা মান্‌কি তাকালো গাসি মুণ্ডার মুখের দিকে, আর গাসি মুণ্ডা চোখ ফেললো পানা মান্‌কির মুখে।

তারপর দু-জনেই বললে, মালগুজারি দেওয়াটা পাপ বটেক।

দলের সবাই মাথা নাড়লো সে-কথা শুনে।

বললে, হুঁ, পাপ বটেক।

সাণ্ডা পুরুষ সুখন, পানা মান্‌কির ভোক্তা। পুবে সূর্য উঠলে সুখন তার ছায়া, আর পশ্চিমে ধুপছাঁও পড়লে আকুম।

ধনুকে তীর লাগিয়ে সুখন বললে, তুললাম আঁ আঁপাড়ি, দিই ও গুজারিমুজারিকে খঁতম্‌ করে্য।

চোখের ইশারায় থামতে বললে পানা মান্‌কি। থামতে বললে গাসি মুণ্ডা।

বললে, না, খাজনা দিব নাই। এ ক্ষেতিজমি রাজার থাক্‌, হামরা অন্য দেঁহাতে যাবো, লতুন ক্ষেতি বানাবো হামরা।

—চলে যাবোক? খেতিখামারি ছেড়ে চলে যাবোক? বিস্ময়ে চোখ কপালে তুললো সবাই।

মাথা দোলালো গাসি মুণ্ডা। বললে, হঁ। খাজনা দিব নাই। আজ বলবেক তিন দামড়ি, কাল বলবেক পাঁচ দামড়ি, শেষে সব হুড়ুটাই রাজা কাড়ে লেবেক্‌। খাজনা দিব নাই।

খাজনা দেয়া পাপ। মাটিতে লাঙল ছোঁয়ানো পাপ। আর রাজারা লোভী, খাজনা বাড়াতে বাড়াতে সব ধানটাই কেড়ে নেবে।

লক্ষ লক্ষ আদিম অরণ্যচর মানুষ বন পুড়িয়ে গাড়ার জল ছিটিয়ে বীজ ছড়িয়ে ফসল ফলিয়েছে, গ্রাম বেঁধেছে মনের সুখে। তারপর জমিদারের চোখ পড়েছে সে-জমির ওপর, চেয়েছে খাজনা। তারপর খাজনার নাম শুনেই গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে তারা। আরও গভীর বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে।

গাসি মুণ্ডার দলও পিঁপড়ের সারির মতো পথ খুঁজে খুঁজে এগিয়ে চললো উত্তরের দিকে। আরো গভীর অরণ্যের দিকে।

বন আর বন। মাঝে মাঝে শাল মহুয়ার ভেতর থেকে মাথা তুলেছে ছোটো-ছোটো পাহাড়ের ঢেউ। সন্ধ্যার ছায়া-ছায়া অন্ধকারে মনে হয় যেন পাহাড় নয়, একপাল অতিকায় লোমশ ভালুক দু-পায়ে থপথপ করে এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু দিনের রক্তিম সূর্যালোকে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় এই মাটির তরঙ্গ, বনের শ্যামলিমা। পানা মান্‌কি আর গাসি মুণ্ডার পিছনে পিছনে কলকোলাহলের উদ্দামতায় পিঠে তীর-ধনুক এঁটে, কাঁধে টাঙি-কুড়ুল নিয়ে জোয়ান পুরুষের দল হেঁটে চললো গহন অরণ্যপথ ভেদ করে। আর তাদের পিছনে পিছনে মালপত্র বোঝাই একসারি গরুর গাড়ি, জাঁতার মতো ছোটো-ছোটো তার চাকা। মালপত্রের পিছনে শিশুবৃদ্ধ, সুস্থদেহ নারীদের পদক্ষেপ।

গাসি মুণ্ডার বৃদ্ধা গৃহিণী লাপ্‌রির পিছনে মেয়েদের পদক্ষেপে বনের বুকে শব্দ কাঁপে, চিৎকার হট্টগোল, ঢোলকের তূর্যনিনাদ বেজে ওঠে। তারপর আবার একটা পুরুষের দল তীর-ধনুক উঁচিয়ে সজাগ চোখে অনুসরণ করে তাদের, এপাশে-ওপাশে লক্ষ্য রাখে কোনো বন্যজন্তু না হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে।

এমনি করে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত পাহাড় অরণ্য উত্তরের পথ অতিক্রম করে এক পাহাড়ী উপত্যকায় এসে থামলো মুণ্ডার দল। চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলে গাসি মুণ্ডা, খোঁজ নেবার জন্যে লোক পাঠালে।

না, জনমনিষ্যির দেখা মিললো না কোথাও। না ওঁরাও, না জুয়াং। শত্রুর ভয় নেই।

তবে এইখানেই খুঁটি গাড়তে হবে। ডেরা বাঁধতে হবে নতুন করে। এখানে নিশ্চয় বারো বেহারার ডুলি-পালকি এসে হাজির হবে না, কুর্তাকামিজের কোনো মালগুজারিবাবু এসে বলবে না,

খাজনা দাও। সেরমা চাঁদোর দেওয়া জঙ্গল পড়ে আছে, সাফ করে ছড়ধানের চাষ করবে। ভুট্টার ক্ষেত বানাবে। চাঁদো বোঙার দেয়া চক্‌মকি ঠুকে আগুন জ্বালবে, শিকার করবে বুনোহাঁস খরগোস তিতির।

মাণ্ডা পরব করবে এখানেও। ফারতীর সামনে নাচবে, গাইবে, প্রার্থনা জানাবে দেওতার কাছে—রাজার সিপাই যেন এ-জঙ্গলের খবর না পায়।

একটা পাহাড় বেছে নিয়ে তার পায়ের কাছে ঢালু জমি খানিকটা পরিষ্কার করে নিলো মুণ্ডাদের দল। ঝাড় কেটে জঙ্গল পুড়িয়ে মুর্গী বলি দিলো, পুজো দিলো ওড়া বোঙার, সেরমা চাঁদোর, মাদেওয়ের।

রুকুন ওঝা মন্ত্র পড়ে ভূত প্রেত তাড়ালো জমি থেকে, বাঁশী বাজিয়ে নাগমন্তর ছড়াল চারিধারে। বেদবংশীদের সেরা নাগ-মন্ত্রীর শিষ্য রুকুল ওঝা খড়ি গুনলে। না, চুড়িন চুরকিন সব পালিয়েছে মাটি ছেড়ে, নাগনাগী বশ হয়েছে।

রুকুন ওঝার কথা শুনে গাসি মুণ্ডা হুকুম দিলে, ওরা ডেরা বানায়া লে অখন।

সরু-সরু শালকাঠির দেয়াল উঠলো, কাদার ছিটে পড়লো তার গায়ে। পাতার ছাউনি হলো, দু-দুটো গিতিওড়া। 'কুড়ি' মেয়েদের ওড়া উঠলো গাঁয়ের মাঝখানে, সাণ্ডাদের ওড়া গাঁয়ের মুখে।

দলের মাথা বুড়ো গাসি মুণ্ডা হুকুম দিলো নতুন ডিহি পত্তনের।

বাচ্চা বুড়ো মেয়ে মরদ সবাই উঠে-পড়ে লাগলো তাদের সেই পুরোনো 'পীড়ে'র মতোই নতুন একটা পট্টি বানিয়ে নিতে।

ঘরানি শুরু হলো মেয়েদের, টাঙিতে শান দিলো সাণ্ডিরা। শুধু বনভালুক আর চিতাবাঘের ভয়েই নয়, নয়াপত্তনকে ওঁরাও আর জুয়াংদের হাত থেকেও বাঁচাতে হবে।

ডেরা ওড়া বাঁধা হলো, বনশুয়োর শিকার করে এনে, হড়ু চোলাই করে হাঁড়ি ভরিয়ে নাচগান শুরু করলে সব। নাচতে নাচতে দলের মুণ্ডা অর্থাৎ মাথা গাসি মুণ্ডাকে ধরে বসলো সকলে, বললে, আস্থানটার নাম হোক গাসি বুড়ার বৌয়ের নামে। গাসি মুণ্ডার 'ঘর-গম্‌কে' অর্থাৎ গৃহিণী লাপ্‌রির নাম থেকে আস্থানটার নাম হোক লাপ্‌রা।

এক মাথা সাদা-সাদা চুল নেড়ে হাসলে গাসি মুণ্ডা। বললে, হোক তাই।

শুধু পানা মান্‌কির বৌ রাইবা বুড়্‌হি বললে, লাজ নাই রে হেরেল্। গাসি একটো গাঁয়ের মুণ্ডা, তুই পাঁচ মুণ্ডার মান্‌কি বটিস। আস্থানটার নাম উয়ার বৌয়ের নামে হবেক্ ?

পত্তন শুরু হলো লাপরায়।

মারাং গাড়া মানে বড়ো নদী। তবু ছোট্টো পাহাড়ী নদীটার নাম হলো মারাং গাড়া। গাড়ার পাড় ধরে একসারি বনস্পতি। একটা বুড়ো বটের ঝুড়ি নেমেছে চতুর্দিকে, আর তাকে ঘিরে বড়ো-বড়ো কয়েকটা শাল মহুয়া আমলকীর গাছ। ভোক্তা গোঁসাই, গাসি মুণ্ডা আর পানা মান্‌কি পঞ্চায়েত ডাকলে সেই বুড়ো বটের নিচে।

বললে, সেরমা চাঁদো স্বপ্ন দিয়েছে, এই গাড়ার জল ছুঁয়ে যে বটের ঝুড়ি নেমেছে, শাল গাছের মাথা উঠেছে আকাশ অবধি, এই আস্থানেই হবে লাপরার গাঁওদেহাতী সার্‌না। এ-গাছের গায়ে কেউ হাত দেবে না, জারার আগুন যেন এ-গাছের পাতা না ছোঁয়। গাঁয়ের দেওতা, মুণ্ডাদের ভগবান স্বপ্ন দিয়েছেন, এই সারনায় প্রতিষ্ঠা নেবেন তিনি। সারা গাঁয়ের মানুষকে রক্ষা করবার জন্যে অধিষ্ঠান করবেন মাদেও আর ফারতী, এই বুড়ো বটের নিচে।

মহাদেব আর পার্বতী। সুবর্ণরেখার ওপারের ডেকো অর্থাৎ হিন্দু, আর তুড়ুক মুসলমানদের গাঁয়ের সঙ্গে দীর্ঘদিনের মেলামেশায় বোঙাদের পাশে কখন যে হিন্দুর দেবদেবী, যমুনা গাড়ার প্রেমের গান মুণ্ডাদের মনেও আসন নিয়েছে কে জানে। গাসি মুণ্ডা শুধু জানে সেরমা চাঁদোর মতোই মাদেও আর ফারতীই বড়ো দেবতা। যেমন গোঁসাই-কিল্লির লোকেরা জানে যমুনা গাড়ার গান, কিষণ আধা অর্থাৎ কৃষ্ণ রাধার গান।

কিন্তু ভোক্তা গোঁসাইয়ের কথায় কান দেবে কে, গাসি হলো গাঁয়ের মাথা। পঞ্চায়েত ডাকলে সে। থরথর করে আবেগে

কাঁপতে কাঁপতে ঘুমের ঘোরে দেখা আদ্যোপান্ত স্বপ্নটা পঞ্চায়েতে হাজির করলে।

নিকষ কালো গায়ের রঙ। আশি বছরের বার্দ্ধক্যে চামড়া জিলজিল করছে। অথচ শরীরে মোটামোটা মজবুত হাড়। শিশু-কাঠের মতো শক্ত চেহারা, যে-কোনো জোয়ান সাঁওতার চেয়ে শক্তি বেশী। কোমরে একফালি কাপড়ের টুকরো, গলায় কড়ির মালা, মাথায় একরাশ তুলোর মতো সাদা-সাদা চুল। এমনিতে শান্ত-শান্ত দেখায়। কিন্তু তেজী চোখজোড়ায় হিংস্রতা আর কোমলতার লুকোচুরি। দলের সবাই এ-চেহারার দিকে তাকাতে ভয় পায়, আবার ভালোও বাসে। এ-মুখে সামান্য হাসি দেখতে পেলে, এতোটুকু স্নেহের ভাষা শুনতে পেলে কৃতার্থ মনে করে নিজেদের। এমন যে গাসি মুণ্ডা, সে নিজের চোখে দেখেছে এ-স্বপ্ন। যেমন-যেমন দেখেছে দলের সকলকে মুখ ফুটে বলেছে তা। আর বলতে বলতে আবেগে আনন্দে থরথর করে কেঁপে উঠেছে সে।

গাসি মুণ্ডার সে-চেহারা দেখে, তার কথা বলার ধরনে, ভয়ে বিভোর হয়ে গেছে সকলে। চাঁদো বোঙা নিশ্চয় ভর করেছে গাসি মুণ্ডার শরীরে, তা না হলে এমন কাঁপতে কাঁপতে কথা বলবে কেন সর্দার। আর বোঙাদের দয়া না হলে এতো-এতো বুড়াবুড়ি থাকতে, এমন কি ভোক্তা গোঁসাই আর পানা মান্‌কিকে বাদ দিয়ে ভগবান বুড়ো গাসিকেই বা দেখা দেবেন কেন! ঠিক লোককেই মুণ্ডা করেছে ওরা, দলের সর্দার হবার যোগ্য মানুষকে। আর গাসি বুড়ার বুড়হি-বৌ লাপ্‌রি আসলে সাধারণ মানুষ নয়, মাণ্ডা পরবের সময় বুড়ি যখন সোকথাইন হতো তখন তো দেখেছে সকলে।

লাপ্‌রির পুজোপ্রার্থনায় খুশী হয়েই হয়তো সেরমা চাঁদো স্বপ্ন দিয়েছেন। এতো-এতো ভোক্তা আর সোকথাইন থাকতে তাই গাসিকেই শুধু দেখা দিয়েছে ভগবান।

ভোরবেলাতেই স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো গাসির। আর স্বপ্নের কথা ভেবে আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছিলো সে।

ছাউনী-ডেরা গিতিওড়া বাঁধা হাওয়ার পর ক-দিন ধরেই বড়ো ভয়ে-ভয়ে কাটছিল গাসির। যতো ভাবনাচিন্তার ভার তো তারই ওপর। দলের দেহাতের ভালোমন্দর সব ভাবনা তার। আর সকলে শুধু হুকুম শুনতে চায়। ডেরা বাঁধার হুকুম দেওয়ার পর থেকে কেবলই আশঙ্কায় দুলেছে গাসি। নতুন পত্তন, নতুন বসতবস্তি। কে জানে ভগবান আশীর্বাদ করবে কি না, বোঙারা অপরাধ নেবে কি না এমন জায়গায় গাঁ বসানোর জন্যে, ভূত প্রেত যুগিন চুরকিনের হাড় এ-মাটির তলায় লুকিয়ে আছে কিনা, কে বলতে পারে।

গাঁ বসানোর আগে দরকার সবচেয়ে পুরোনো কয়েকটা গাছ। যার বয়সের হদিস মিলবে না। সার্না বসাতে হবে সেখানেই। অধিষ্ঠান হবে গাঁয়ের রক্ষাদেবতার। মোরগ আর বুনোমোষ বলি দিয়ে পুজো দিতে হবে। তারপর শুরু হবে জারা, অর্থাৎ বন পুড়িয়ে জঙ্গল সাফ করে চাষ আবাদ শুরু হবে। এই হলো রীতি, এইটাই ধরম্। তাই ক-দিন ধরে বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছে গাসি, খুঁজে পেয়েছে ঝুড়ি-নামা এই বুড়ো বটের আস্থান। তারপর দিনরাত ভেবেছে এইখানেই সার্না হবে কিনা, এইখানেই বানাবে কিনা পুজোর বেদী-মণ্ডপ, গাড়বে কিনা বলিদানের কাঠি। আস্থানটা কি পছন্দ হবে দেবতাদের, জমিটায় পাপ নেই তো কোনো? এই সব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলো গাসি। ঘুম-ঘুম চোখের সামনে ঝাপ্সা হয়ে গিয়েছিলো আকাশের চাঁদ তারার হাট। দূর-দূর বনের গাছগুলো ক্রমশঃ কালো হয়ে গিয়েছিলো অন্ধকারে মিশে। তার-পর কখন যে নিজেরই অজান্তে ঘুমিয়ে পড়েছিলো টের পায় নি।

হঠাৎ দেখলে চতুর্দিক আলো করে একটা বিরাট চাঁদ যেন এগিয়ে আসছে তার দিকে। সে-আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেলো গাসির।

দেখলে, সিল্লির জলে ডুবে মরেছিলো যে রুখা মুণ্ডা, গাসির আগে যে ছিলো এ-দলের সর্দার, ঠিক তার মতো হাসি। হাসি-মুখের এক-জন কে যেন এগিয়ে এলো। সুন্দর সুপুরুষ চেহারা, বাঁ-কাঁধে টাঙি আর কপালে সেঙ্গেলের আলো। কোয়েলের পালকের মতো কালো চকচকে শরীরে এক টুকরো সাদা ফুটফুটে কৌপীন। ডান হাতের ছড়িটা তুলে ধরতেই সেরমা চাঁদোকে চিনতে পারলো গাসি। গড় হলো তার পায়ে। দেওতা তখন মৃদু হেসে বললে, গাড়ার জল ছুঁয়ে যে বুড়ো বটের আস্থান, ওখানেই সার্না বাঁধ। চাঁদো বোঙা যেন বললে, মালগুজারি দিয়ে তোরা পাপ করিস নাই বলে খুশী হয়েছি বেটা। সার্নায় পুজো দিবি আমার, আর পরবের সময় মোষ বলি দিবি। তা হলেই তোদের রক্ষা করবো আমি।

স্বপ্নের বৃত্তান্ত পঞ্চায়েতের সামনে হাজির করলো গাসি, থরথর করে কেঁপে উঠলো বলতে বলতে। তারপর হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো সেখানেই। মুখ দিয়ে ফেনা বের হলো, আর কয়েকটা অস্পষ্ট কথা।

পঞ্চায়েতের সকলে সমস্বরে চিৎকার করে উঠলে, ভর হইছে।

জ্ঞান হওয়ার পর চোখ চেয়ে দেখলে গাসি, ছেলেবুড়ো মেয়েমরদ সব ঢোলক বাজিয়ে নাচতে শুরু করেছে, গাইছে চাঁদো বোঙা আর মাদেওয়ের গান।

নাচ থামিয়ে 'কুড়ি' যুবতীর দল ছুটলো গাড়ার দিকে। জল এনে ঢাললো বটের গুঁড়িতে, ঘাস পাতা সাফ করে বানালে সার্নার বেদী, বাঁধলে চবুতরা।

সার্না মিলেছে, দেওতা বসেছে, এবার ভাবতে হবে চাষবাসের কথা। বললে গাসি। হরিয়াল শিকার করে তো সারা জীবন চলবে না। শিন্দ্রা শিকারী নয় তারা। বির-হরদের মতো বুনো মানুষ নয় তারা, বনের মানুষ। মুণ্ডা মানে মাথা। মাথা আছে যখন, জানোয়ারের মতো শুধু শিকার করে পেট ভরাবে কেন? বেদিয়া

বির-হরদের সঙ্গে মুখের রা-রড়্‌ এক হতে পারে, কিন্তু মানুষ অন্য।

খুঁটকাটহিদার বাছতে হবে এবার। জারার হুকুম দেবার আগে দরকার চারজন সীমানাদার। খুঁটকাঠি পুঁতে এলাকার হিসেব রাখবে যারা, কোন পরিবার কতো পাবে তার নাপী নির্দেশ দেবে যারা।

চারজন সীমানাদারের দু-জন এসেছে দলের সঙ্গে, একজন মারা গেছে অনেক আগেই। আর অন্যজন—কথাটা মনে পড়তেই রাগে থুতু ফেললে গাসি। মুণ্ডাদলের কাঠিদার হয়ে ডুলি-পালকির মাল-গুজারিবাবুর সঙ্গে যোগসাজসে পাপ করতে ঘৃণা হলো না তার? কিসের লোভে কে জানে, মালগুজারিবাবুর তাঁবেদারিতে কাজ নিয়েছিলো সে। গাসির নিষেধ শোনে নি।

তাই দু-জন নতুন কাঠিদার বাছতে হবে।

—ডোংরা। ডোংরার হাতে কাঠি লাগাও। বললে ভোক্তা গোঁসাই।

খুশীতে মাথা নাড়লে গাসি। আর গাসির সম্মতি দেখে সারা পঞ্চায়েতের মাথা নড়লো।

শুধু পানা মান্‌কির পছন্দটা বোঝা গেলো না।

—আরেকজন?

—টাংরাটির সাণ্ডি ছেলে আকুম, আকুমকে কাঠি লাগাও। পানা মান্‌কি বললে, বেশ জোর গলায়, যাতে পঞ্চায়েতের সবাই শুনতে পায়।

আগে জানলে গাসি হয়তো মেনে নিতো, হয়তো অন্য নাম বলতো না। কিন্তু পানা মান্‌কির কথার সঙ্গে সঙ্গে গাসিও নতুন নাম বলে ফেললো।

বললে, বুড়া উধম। বুড়া হইছে, রীতনীত জানে লোকটা। জানে হিসাবগুস্তি, আইন-কানুন।

ছুটো নামই, দুজনের কথাই প্রায় এক সঙ্গে শুনতে পেলো পঞ্চায়েত। পানা মান্‌কি চায় আকুমকে, আর গাসি চায় উধম বুড়াকে।

কিন্তু কোন দিকে মাথা নাড়তে হবে বুঝলো না কেউ। একবার পানা মান্‌কির মুখের দিকে, একবার গাসির দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলো। গাসি হলো একটা গাঁয়ের মুণ্ডা আর পানা পাঁচ মুণ্ডার মান্‌কি ছিলো। গাঁ দেহাত ছেড়ে খাজনার ভয়ে যখন এক এক গাঁয়ের লোক এক একদিকে ছুটলো তখন এ-দলের সঙ্গ নিয়েছিলো পানা মান্‌কি। পট্টিপীড় ভাঙলো বলেই মান্‌কিয়ানা হারিয়েছে পানা। বাঁশরিয়ার নারোম মুণ্ডাও ছুটে আসতো এই পানার কাছে, বিয়াকাজির বিচার নিতে।

তবে হ্যাঁ, বুদ্ধির কথাটো গাসিই ঠিক্ কয়েছে। উধম হলো বুড়া, রীতনীত জানে, জানে হিসাবগুস্তি। আর সাণ্ডিজোয়ান আকুম? জানে শুধু ঠিগিয়ার নাচ।

তুলোর মতো সাদা-সাদা চুলের মাথা নেড়ে গাসি বললে, খুঁটিদার হলো খুঁটিদার। না পীরিত না কাজিয়া, জোয়ানের কাম লয় হিসাবগুস্তির।

রেগে টং হয়ে উঠলো পানা।

কোনো কথা বললো না। পোড়ামাটির কল্‌কেটা বের করে চক্‌মকি ঠুকে ঠুকে সোলার টুকরোয় আগুন ধরালে। তারপর হাতের মুঠোয় কলকেটা বাগিয়ে ধরে জোরে টান দিলো একটা। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বুঁদ হয়ে বসে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎ এক লাফে দু-পা এগিয়ে এলো। উবু হয়ে বসলো পঞ্চায়েতের সামনে।

বললে, তিন তিনটা খুঁটিদার, সব বুড়া। একটো জোয়ান না থাকলে লাপ্‌রার মাটিতে আগুন লাগবে। বুড়াগুলান মরলে কে রাখবে হিসাবগুস্তি?

ঠিক্, ঠিক্। টনক নড়লো পঞ্চায়েতের। মাথা দোলালে তারা। সত্যিই তো, পানা মান্‌কি ঠিক কথাই বলেছে।

আর তা দেখে হাসলো গাসি।

বললে, জোয়ানরা হবে খুঁটিদার? খুঁটিটা হলো বিচারের কথা, ও বুড়ারাই হয় বটে। আর রীনিতীত? কানে, বুড়া ডোংরা, বুড়া উধম কি উয়াদের বেটাদের 'নাপী শিখায় না? কাজকাম দেখে না বেটারা? ডোংরা মরে তো উয়ার হপন আছে, উধমকে বোঙারা ডাকে লয় তো তার হপন আছে।

ঠিক্ ঠিক্। মাথা নাড়লে পঞ্চায়েতের সকলে। সত্যিই তো, গাসি ঠিকই তো বলছে।

গাসি কখনও ভুল বলতে পারে! সে হলো দলের সর্দার, গাঁয়ের মাথা। চাঁদো বোঙার ভর হয় তার ওপর। ঠিক তো বলবেই গাসি।

—উধম হোক খুঁটিদার, উধম। চিৎকার করে উঠলো সকলে।

রাগে উঠে দাঁড়ালো পানা মান্‌কি। রক্তচক্ষু মেলে তাকালো একবার সকলের দিকে, তারপর জোরে জোরে পা ফেলে বেরিয়ে গেলো পঞ্চায়েত ছেড়ে।

সব রাগ গিয়ে পড়লো গাসির ওপরে। একটো গাঁয়ের মুণ্ডা হলো গাসি, সে কিনা পাঁচ গাঁয়ের মান্‌কিকে অপমান করে। পাপের আগুনে ধ্বংস হবে লাপ্‌রা। যুগিন এসে রক্ত চুষে নেবে গাসির। বলতে বলতে চলে গেলো পানা।

গেলো তো গেলো। তার জন্যে জারা কি আটক থাকবে নাকি?

হুকুম দিলো গাসি, আগুন জ্বলে উঠলো লাপরার জঙ্গলে।

যতোখানি প্রয়োজন, যে-পরিমাণ জমি চাষ করা দলের পক্ষে সম্ভব ততোখানি জঙ্গল পরিষ্কার করে ক্ষেত বানিয়ে নিয়ে সে-জমির ওপর মালিকানার স্বাক্ষর রাখতে হলে জারার রীতি মানতে হবে। তাই জঙ্গলের চারকোণে খুঁটি গেড়ে পুজোপার্বণ মোরগবলি সেরে গাছে গাছে আগুন ধরিয়ে দেবার হুকুম দিলো গাসি নিজে।

দেখতে দেখতে আগুন ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে। রাতের অন্ধকারে মনে হলো বিদ্যুতের মতো আগুনের শিখা ছুটে চলেছে একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। বাতাসের তাপ বাড়লো, ঝড় উঠলো। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতোই এক জ্বলন্ত আগুনের ঢেউ যেন বাতাসে নেচে-নেচে চললো, আর দাউ-দাউ করে শিখা উঠলো আকাশ পর্যন্ত।

সমস্ত বন-বনান্ত জুড়ে আগুন আর আগুন। আর তুমদা মাদলের তালে তালে সমস্বর গান আর চিৎকার।

গ্রামের দিকে, যেখানে খুঁটি গাড়া হলো সেদিকে সারি নাচ শুরু হলো মেয়েপুরুষ মিলে। হাতে টাঙি, পিঠে ধনুক নিয়ে এক সারি সমর্থ-শরীর পুরুষ গলা ছেড়ে চিৎকার দেয় থেকে-থেকে, আবার মেয়েদের গান আর নাচের তালে মাদল বাজে, বাঁশির সুর বাজে। ডুম-ডুম, ডুম-ডুম একটানা ঢোলকের আওয়াজ আর পাহাড়-কাঁপানো সুরে গান গায় সকলে।

সারা রাত সারা দিন ধরে চলে নাচ আর গান, যতোক্ষণ না জারার আগুন আপনা থেকে নিভে যায়। বিলম্বিত লয়ে টেনে-টেনে একটা কলির ধুয়ো ধরে একজন, তারপরই গলায় গলা মিলিয়ে একসঙ্গে গেয়ে ওঠে সকলে। পাহাড়ের গা থেকে প্রতিধ্বনি ফিরে আসে সে-গানের।

এদিকে টাঙি উঁচিয়ে তৈরী থাকে পুরুষরা।

আগুনের তাপে প্রাণভয়ে না গ্রামের দিকে ছুটে আসে বন্য জানোয়ারের দল। সেই ভয়ে থেকে-থেকে চিৎকার করে পুরুষরা।

সমস্ত বনভূমি জুড়ে চলে আগুনের নাচ। রাতের অন্ধকারের বিকেলীমেঘের মতো লাল হয়ে ওঠে সারা দিগন্ত। আকাশের গায়ে লাল মেঘের আভা যেন। আর জারার আগুনের ছটা লেগে কালো-কালো স্বাস্থ্যবান চেহারার মেয়ে পুরুষের দলকে মনে হয় অপরূপ।

গান আর নাচের নেশায় ডুবে গেলো সকলে। খোঁজ নিলো না, কে আসে নি জারার নাচে।

ঢোলকের আওয়াজ, সাণ্ডিদের চিৎকার আর কুড়ি যুবতীদের করুণ একটানা সুর ছাপিয়ে ভেসে আসছে বনচর বিহঙ্গের কলকাকলী। ঝাঁকে-ঝাঁকে বনমোরগ হরিয়াল তিতির উড়ে পালাতে গিয়ে আগুনের হলকায় ঝলসে গেলো। একটা নীলগাইয়ের দল ছুটে পালালো জ্বলন্ত গাছের গুঁড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে।

একটার পর একটা জ্বলন্ত শাল মহুয়ার গাছ ভেঙে নুয়ে পড়ছে সশব্দে। ভেসে আসছে বন্যজন্তুর তীব্র আর্তনাদ। লেলিহান শিখা দুলিয়ে বড়ো-বড়ো শাখাপ্রশাখা উড়ে যাচ্ছে ঝড়ো বাতাসে।

আমলকি আর হরিতকী গাছের ফাঁক দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো একসারি হরিণ। একটা মহুয়ার গুঁড়ির আগুনে চাপা পড়লো কয়েকটা চিতাবাঘের বাচ্চা। বনশুয়োরের দল বিভ্রান্ত চোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়লো। চিতা বাঘ, বনভালুক, নীলগাই আর সিঙাহরিণের দল আগুনের ওপর দিয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটে পালালো দূরের পাহাড়ে। শ্লথগতি একটা অতিকায় সাপ বহরা ঝোপের গায়ে জড়িয়ে ছিলো, তিল তিল করে পুড়ে মরলো সাপটা। কেউটে করাতী গোখরো সাপের বাচ্চাগুলো কিলবিল করে মাটিতে মুখ লুকোলো। আকাশ বাতাস কেঁপে উঠলো পশু আর পাখির চিৎকারে।

কুড়িদের গান, সাণ্ডিদের চিৎকার আর তুমদার আওয়াজে ভয়ে পেয়ে আরো গভীর জঙ্গলের দিকে পালালো বনের জন্তুগুলো। মালগুজারির ভয়ে ঠিক যেমনভাবে পালিয়ে এসেছিলো গাসি মুণ্ডার দল।

রাতের পর রাত চলে জারার নাচ। মহুয়ার মদে যেন নেশায় বুঁদ হয়ে গেছে সব। কেউ আর খোঁজ রাখে না, কে আসে নি জারার নাচে।

গাসি মুণ্ডা জানে, শুধু পানা মান্‌কি আসে নি। আসবে না পানা। গাসিও জানে।

সেই যে ক্রোধে অপমানে পঞ্চায়েত ছেড়ে চলে এসেছিলো পানা, তারপর থেকে দলের কোনো ব্যাপারেই আসে নি।

সে ছিলো পাঁচ গাঁওয়ের মান্‌কি, পাঁচ মুণ্ডার সর্দার। আর এক গাঁওয়ের সর্দার গাসি কিনা তার কথা রাখলো না; ইজ্জত রাখলো না তার!

জ্বলুক জারা। জারা জ্বলবে, নিভবে। সমস্ত বন পরিষ্কার হবে একদিন। মারাং-গাড়ার জল এনে ঢালবে বাচ্চা বুড়ি সবাই। তারপর খুঁটির গায়ে হলুদ আর গিরি মাটির আলপনা আঁকবে মেয়েরা। চার খুঁটির সীমানায় যতো ক্ষেত বানাবে তারা, এই দলেরই কায়েমী স্বত্ব থাকবে তার ওপর। ওঁরাও জুয়াংরা এসে এ-জঙ্গলে যদি বা হানা দেয়, তবু এই খুঁটির নিশানা মানবে তারা। বন পুড়িয়ে নতুন ক্ষেতি বানিয়ে নিতে হবে তাদের।

আর খুঁটিদাররা হিসাবগুন্তি করে প্রত্যেক পরিবারের প্রয়োজন মতো জমি বিলিয়ে দেবে দলের সকলকে। যে যার নিজের জমি চাষ করবে, হুড়ু নয়তো মকাই। বিধান দেবে এই খুঁটিদাররা, তখন আর মুণ্ডা মান্‌কির হুকুম চলবে না ক্ষেতের ফসলের ওপর।

কিন্তু গাসির কথায় খুঁটিদার হলো যারা, বিধান দেওয়ার আগে তারা তো শলা করবে ঐ গাসির সঙ্গেই। পানা মান্‌কির কথা শুনবে কেন তারা!

এই সব ভেবেই রাগে দপ্‌দপ্‌ করে উঠে চলে এসেছিলো পানা, পঞ্চায়েত ছেড়ে এসে ঢুকেছিলো টাংরাটির ডেরায়।

বলেছিলো, তুমার বেটাকে খুঁটি দিলো না গাসি, আকুমরে খুঁটিদার করতে নারাজী হলো।

আর আকুমকে বলেছিলো, গাসি বুড়া মান্‌কির ইজ্জত রাখে নাই, খুঁটি দেয় নাই তোকে। গাসি তোর দুষমন, মুণ্ডাদের দুষমন। জারার নাচে যাবি না তুই।

—না, যাবো নাই। কথা দিয়েছিলো আকুম।

কি করে যাবে সে জারার নাচে ? গিতিওড়ার পাশের হরিতকী গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না ? রাঙিনার সঙ্গে দেখা হবে কি করে তা না হলে ?

ঠিগিয়ায় নাচ হলে নয় কথা ছিলো।

জারার নাচে যোগ দিলে কি গাসি মুণ্ডার মেয়ে রাঙিনার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করার সময় আর সুযোগ পাবে আকুম। নিজের মনেই হাসলো সে পানা মান্‌কির কথাটা ভেবে। তারপর ধীরে ধীরে মেয়েদের ঘুম-ঘর 'গিতিওড়ার' ধারে একটা গাছের আড়ালে এসে দাঁড়ালো। অপেক্ষা করলে কিছুক্ষণ।

স্পষ্ট দেখা না গেলেও জারার আগুনে আশেপাশের গাছ-গুলোও লাল হয়ে উঠেছে। পাতা-কাঠির ছাউনি দেয়া ওড়া ডেরাতেও পড়েছে লালের ছিটে। অনেকখানি দূরে নাচের উৎসব চলেছে, ত্থ-চারজন ছাড়া মেয়ে-পুরুষ সবাই গিয়ে জুটেছে ওখানে। তাই ধরা পড়ার ভয় নেই তেমন। সাহসে ভর করে লুকিয়ে অপেক্ষা করলে আকুম।

একটু পরেই গিতিওড়ার ঝাঁপ খোলার শব্দে চমকে ফিরে তাকালো সে। ঠিক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে রাঙিনা। ভয়চকিত চোখে তাকাচ্ছে এপাশে ওপাশে। ঘুম-ঘরের বিধবা খবর্দারনী না টের পায়, অন্য কেউ দেখতে পেয়ে শেষে ফিসফিস করে জানিয়ে না আসে বুড়ির কানে।

ঝাঁপের দরজায় এক হাত রেখে এপাশ ওপাশ দেখলে রাঙিনা, তাকালে দূরের জারা-নাচের দিকে।

হাসিতে খুশিতে ভরে উঠলো আকুমের মুখ।

বাঁশীটা কোমরে গুঁজে বাবরীচুলে গাঁথা লাল কাঠের কাঁকুইটা আবার ঠিক করে নিলো। না, রাঙিনা যেন টের না পায় ও এখান অবধি ধেয়ে এসেছে। অপেক্ষা করছে।

রাঙিনার দিকে আড়াল থেকে তাকিয়ে খুশিতে মাথা নাড়লো আকুম।

সত্যি, এতো রূপ রাঙিনার ? টলমল কালো মুখে ঘামের চিকন, বুক আর সুঠাম শরীর থেকে যেন রূপের জল ঝরে পড়ছে। ভরা নিটোল মুখের ওপর ছায়া ফেলেছে দূর-আগুনের সিঁদুর, কালো কালো হরিণচোখের তারায় যেন চকমকির ফুলকি। আনন্দে খুশিতে মাথা দোলালে আকুম।

আস্তে আস্তে ঝাঁপ বন্ধ করলো রাঙিনা। তারপর চোরা চোখে এধার ওধার দেখে নিয়ে তর্‌তর্‌ করে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলো মারাং-গাড়াব জলের দিকে। আর আড়ালে আড়ালে মুখে কৌতুকের হাসি চেপে তাকে অনুসরণ করলো আকুম। একটি ছায়াশরীর যেন সারা বনপথের আশেপাশে যৌবন ছিটিয়ে ছড়িয়ে অপরূপ ভঙ্গিমায় হেঁটে চলেছে, পিছনে তার একটি পুরুষের আনন্দ-অনুসরণ।

সারনার চবুতরা পার হয়ে নদীর পারে এসে থামলো রাঙিনা। তাকালো এদিকে ওদিকে। আকুমের খোঁজ করলো ভয়-ভয় চোখে। আশঙ্কা, সন্দেহ। দ্রুত পায়ে নেমে গেলো গাড়ার জলের দিকে। বালিতে পা ডোবালো। উঠে এলো আবার নদীর ধারের মোটা-গুঁড়ি নিম গাছটার নিচে। একখানা বিশাল পাথরের চাঙড় জলের ধারেই। এমন ভাবে রয়েছে যেন যে-কোনো মুহূর্তে গড়িয়ে পড়বে। বর্ষার ঝরনার ঝাপটায় ক্ষয়ে ক্ষয়ে পাথরের ওপরটাও মসৃণ হয়ে গেছে। দুপুরে জল নিতে এসে পাথরটার ওপর ঘুম-ঘরের কুমারী মেয়ের দল বসে, জিরোয়, খেলা করে, গড়াগড়ি দেয় এধার থেকে ওধার অবধি। কুলকুল কুলকুল শব্দ করে জলের স্রোত বইছে পাথরের বাধা পেয়ে, নুড়ির রাশিতে নুড়ি গড়িয়ে পড়ে আওয়াজ তুলছে টুং-টাং। অপূর্ব এক জলতরঙ্গের অঙ্গে অঙ্গে নুড়ি পাথরের নিক্কন। মাঝরাতের গান 'যমুনা গাড়া জাপা'র মতো একটানা করুণ সুরের অশ্রু ঝরে পড়ছে যেন। কুলকুল কুলকুল শব্দের জলকল্লোল, আর টুং-টাং শব্দের সঙ্গত। ঐ সুরে

মন উতলা হয়, মেয়েগুলো খিলখিল হাসিতে গড়ায়, এ ওকে জড়িয়ে ধরে বন্য যুবতীর দল।

নিম গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে বিস্তৃত পাথরের বিছানাটার দিকে তাকালো রাঙিনা। না, আকুম আসে নি এখনো। উৎকণ্ঠা ফুটে উঠলো ওর মুখে চোখে।

মুহূর্ত কয়েক অপেক্ষা করলে রাঙিনা, তারপর যেখানে পাথরটা প্রায় হেলে পড়েছে জলের ওপর, সেখানে গিয়ে বসে পড়লো। পা ডুবিয়ে দিলো জলে।

কোথায় গেলো আকুম? জারার নাচে যাবে না বলে শেষকালে কি কোনো বন্ধুর পাল্লায় পড়লো নাকি?

জারার নাচ! কল্পনায় ভেবে নিয়েই খিলখিল করে হেসে উঠলো রাঙিনা, নিজের মনেই। আকুমের হাতে টাঙি? পিঠে তীর-ধনু? তীর ছুঁড়ে সিন্দরা করবে আকুম? না, টাঙির চেয়ে বাঁশীই মানায় ওর হাতে। তিরগিয় বাজায় যখন তিরিরিরি তিরিরিরি, মন ভুল হয়ে যায় রাঙিনার। ঘুমঘরের খবর্দারনীর কথাও ভুলে যায় ও।

অকারণেই আবার খিলখিল করে হেসে উঠলো রাঙিনা। পাথরটায় বসে পা দোলাতে শুরু করলো জলে।

—উফ্? এই ছাড়ে দে, ছাড়ে দে। চমকে চিৎকার করে উঠেই হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে হেসে ফেললো রাঙিনা। একেবারে পিছন থেকে এসে দু-হাতে জড়িয়ে হঠাৎ তাকে বুকের কাছে তুলে নিয়েছে আকুম, পায়ের শব্দটুকুও পায় নি ও।

আকুমও হেসে উঠলো সশব্দে। রাঙিনাকে নামিয়ে দিয়েই ধপ্ করে বসে পড়লো গা ঘেঁষে।

'তিরিরিরি রুতু সারিতানা।'

গানের কলি ভাঁজলে আকুম, তারপর হঠাৎ এক লাফে উঠে

দাঁড়ালো, ছুটে গেলো কাছের ঝোপটার দিকে। এক রাশ বনফুল তুলে এনে গুঁজে দিলো রাঙিনার চুলে।

'সেঙ্গেল কুসুম্বি, কুসুম্বি বাহা।'

আবার একটা কলি ভাঁজলে আকুম। আগুন ফুল, কুসুম বাহার। ফুলকে দিলাম আগুনের ফুল, আগুনকে দিলাম বনের কুসুম।

রাঙিনা হেসে গড়িয়ে পড়লো, আকুমের বুকে মুখ ঘষলে। তারপর হঠাৎ তার পেটে একটা চিম্‌টি কেটে সরে গেলো।

নীলাভ ছাই-ছাই রঙের মসৃন পাথরটা যেন নরম রেশমের জাজিম। হঠাৎ পাথরটার ওপর হাত পা ছড়িয়ে সটান শুয়ে পড়লো আকুম। চিত হয়ে আকাশের চাঁদ তারার দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

তারপর বললে, রাঙিনা।

—উঁ?

—আয় ইখানে।

—ক্যানে? যাবো নাই আমি। কি আছে তুয়ার কাছে?

—চাঁদো।

—চাঁদো আমার ওরাতেও মিলবেক, গাড়াতেও মিলিবেক। তোর কাছে যাবো ক্যানে?

উঠে বসলো আকুম, হঠাৎ এক ঝটকায় টেনে আনলো রাঙিনার শক্ত শরীর। আকুমের পাশে হাঁটু ভেঙে বসলো রাঙিনা। তারপর আকুম হাত ছেড়ে দিতেই সুযোগ পেয়ে কাতুকুতু দিয়ে পালালো।

হাসলো আকুম, কথা বললো না। পাথরে পিঠ ঘষে ঘষে জলের দিকে সরে এলো খানিকটা, পাথর থেকে পা ঝুলিয়ে দিয়ে যেমন শুয়ে ছিলো তেমনি শুয়ে রইলো।

লুকিয়ে লুকিয়ে ফিরে এলো রাঙিনা। যে-দিকে পা ছুটো

ঝুলিয়ে রেখেছে আকুম সেই দিকে এলো পাথরটার আড়ালে আড়ালে, মাথা নিচু করে। তারপর একটা বনতুলসীর শিষ তুলে নিয়ে সুড়সুড়ি দিলো আকুমের পায়ে।

আকুম টের পেলো না।

হঠাৎ পায়ে হাত লাগাতেই বুঝতে পারলে আকুম, দু-পায়ের মাঝে জড়িয়ে ধরলো সে রাঙিনার নরম শরীরের লজ্জালতা।

ছাড়া পাবার জন্যে ওর দাবনার ওপর গুম্-গুম্ করে কিল বসালো রাঙিনা। নরম হাতের আঘাতে কৌতুক বোধ করলে আকুম। হেসে উঠলো সশব্দে।

পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে উঠে বসলো ও। আর রাঙিনা ঝপাং করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। হাসতে হাসতে কি যেন বললে, বুঝতে পারলো না আকুম।

বার বার উঠে আসতে বললো আকুম। ভয় দেখালো, সাপ আছে, কাটবে। কারাকোম কামড় দিবে।

—জলের কারাকোম শুধু কামড়ায়, ডাঙার কাঁকড়া বিষ ঢালে।

—আমি কারাকোম ?

—তুই সুমগিয়া। শয়তান।

—বাপ্‌লার পর শয়তান হবো, এখন লয়।

—হুঁ বটে। কে বিয়া করবে তুয়ারে ? আমার হেরেল্ আনে-ক ভালো হবে। সে শয়তনী করবেক না।

জলে গা ডুবিয়ে ঘুরে বেড়াতে শুরু করলে রাঙিনা, ডাকও শুনলো না আকুমের, উত্তরও দিলে না।

আকুম শুয়ে পড়লো আবার।

ভিজে কাপড়ে উঠে এসে পাশে দাঁড়ালো এবার রাঙিনা, জল ছিটিয়ে দিলে আকুমের গায়ে। তারপর আঁচলটা নিঙড়ে নিয়ে পাথরের আড়ালে চলে গেলো। আঁচলের দিকটা জড়িয়ে নিলো

গায়ে, অন্যদিকটা নিঙড়ে নিতে নিতে কাছে এলো। শুয়ে পড়লো আকুমের পাশে।

খেলার ছলে পাশ ফিরতে ফিরতে গড়িয়ে সরে গেলো দূরে। আরেকটু হলেই নিচে পড়ে যেতো, পাথরের কোণটা আঁকড়ে ধরে সামলে নিলো। তারপর আবার গড়াতে গড়াতে কাছে এলো আকুমের।

কোমর থেকে বাঁশীটা বের করলো আকুম। শুয়ে শুয়েই বাজাতে শুরু করলো।

একটু পরেই সুরে সুর মিলিয়ে গান আরম্ভ করলো রাঙিনা।

তিরিরিরি রুতু সারিতানা
মাদ সোকোম চোরোরোরো,
সোবেন হাইকো নির-তা-না!
তিরিরিরি রুতু সারি তা-না!!

আকুমের বাঁশের বাঁশী সুর কাঁপায় আর গলা ছেড়ে গান জুড়ে দেয় রাঙিনা।

যমুনা গাড়া জপা
বুরু গিতিল কদম সুবা
তিরিরিরি রুতু সারি-তা-না।

হঠাৎ বাঁশী থামায় আকুম। —যমুনা গাড়ার গান কুথায় শিখন লাগলো রাঙিনা!

—মনটা শিখায়ছে আমারে। ঠোঁট টিপে টিপে হাসলে রাঙিনা, তারপর আড়চোখে আকুমের মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, তুয়ার পীরিতটা শিখায়ছে বটে।

—হাসিস ক্যানে?

রাঙিনা ঠোঁট টিপে টিপে হাসলো আবার। —ধন্দ লাগলন বুঝি! ক্যানে, দলে কি সাঙি নাই? সুখন শিখায়ছে এ-গান।

—সুখন ? বিস্ময়ে চোখ কপালে তুললো আকুম। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, এ-গান অধরমের গান রাঙিনা, ওরার টুড্‌না বুড়ির সামনে গাইবি না গানটো।

হাসি লুকোবার জন্যে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রাঙিনা বললে, সুখন বড়ো মিঠা গায় বটে।

আকুম শুধু বললে, হুঁ। তারপর কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলো। রাঙিনা বুঝলো কাজ হয়েছে তার কপটতায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও পেলো। সশব্দে বাতাস কাঁপিয়ে হেসে উঠলো ও।

আকুম জানে সুখন এসে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে, যখন জল নিতে আসে রাঙিনা। ওরার কুড়ীদের সঙ্গে সাঁতার কাটে সে, আর আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে সুখন।

হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠে রাঙিনা, খোঁপায় ফুলগুলো গুঁজতে গুঁজতে বলে, পীরিত জানতে আসেছিল, একটো চড় মারে দিছি। ওরার যুব্‌তী আমি, ইজ্জত রাখতে জানে নাই শয়তানটো।

—ও গানটো শিখলি কুথায় বল্। আবার প্রশ্ন করে আকুম।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ কাছে বসে পড়ে রাঙিনা। দু-হাঁটুর ফাঁকে মুখ লুকিয়ে ধীরে ধীরে বলে, সিল্লির ওঁরাও বুষ্টমনীর কাছে শিখছি।

—যমুনার গান, কদম সুবার গান তু ঘরে গাইবি না, টুড্‌না বুড়ি ক্ষ্যাপে যাবেক, তোর বাপকে বলে দেবে খবর্দারনী বিধ্‌বাটা।

—ক্যানে ? যমুনার গান কি খারাপ বটে ?

—হঁা। ও-গানে আমাদের ধরম নাই। গলায় কণ্ঠি, কপালে তিলক আঁকে গোঁসাই হয়েছিল গোহিন্দ ওঁরাও, তা পাঁচ গাঁওয়ের মান্‌কি পানা বুড়া সিল্লির হাট থেকে মারে তাড়ায় দিছে ওকে।

—গোহিন্দ ওঁরাওকে দেখেছিস তুই ? উয়ার গানে নাকি গাছ লড়তো, সাপ নাচতো !

—শুন্যেছি। গাঁয়ের সকল লোকই শুন্যেছিল। তাই ফুলবুদ্‌না

করে পাপ তাড়াতে হয়েছিল। তবে হাঁ, গান গাইতো, বড়ো মিঠা গান উয়ার।

—কুথায় আছে সে অখন? উয়ার গান শুনতে বড়ো মন ইচ্ছা যায় রে।

আকুম দীর্ঘশ্বাস ফেললো সশব্দে। বললে,. উ তো জঙ্গলে পালায়ছে।

চুপ করে শুনলো রাঙিনা। গোহিন্দের জন্যে ব্যাথায় ছল্‌ছল্‌ করে উঠলো ওর দু-চোখ। এতো সুন্দর গান জানতো যে, তাকে কিনা মেরে তাড়ালো সকলে? পানা মান্‌কির বিচারে?

—মান্‌কিটা মানুষ লয় আকুম।

—হুঁ।

—তোরা বারুণ করলি না ক্যানে!

—ধরমে বিধান রয়েছে যে।

—গোহিন্দের বহুটা গাইতো ক্যানে তবে?

রাঙিনার খোঁপা থেকে ফুলগুলো খুলে নিয়ে মুখে পুরে দিলো আকুম, চিবোতে চিবোতে বললে, উ তো অন্য ধরমের লোক!

রাঙিনা হেসে উঠলো হঠাৎ। —উ-ধরমটা ভালো বটে। ই-ধরমটা আমার ভালো লাগে না, তোদের ধরমে ভালো গান নাই। বলেই খিলখিল করে সশব্দে হেসে উঠে ছুটে পালালো রাঙিনা।

আকুমও এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে যাচ্ছিলো রাঙিনাকে ধরবার জন্যে, হঠাৎ পেছন থেকে কড়া গলার কাপালিক কণ্ঠ-ভেসে এলো। —আকুম!

ওদিকে যখন সারা বন জুড়ে আগুনের বন্যা বয়ে চলেছে, পানা মান্‌কির মনেও তখন ক্রোধ আর আক্রোশের জোয়ার। জারা জ্বলছে। জারা জ্বললো তাহলে পানা মান্‌কিকে বাদ দিয়েও? জ্বলুক, সারা পত্তনটাই নয় জ্বলে-পুড়ে শেষ হয়ে যাবে একদিন! ও শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে। তারপর সময় হলে পানা মান্‌কির কদর বুঝবে গাসি মুণ্ডা। সারাটা ডিহি টের পাবে কোন ধাতুর মানুষ সে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে সে, দেখেই যাবে। মনে মনে ভাবলো পানা।

কিন্তু ধৈর্য মানবে কেন? মনে যখন আগুন জ্বলে তখন স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে নাকি কেউ? ঐ যে ভোক্তা গোঁসাই ফুলকুদ্‌নার সময় আগুনের ওপর হেঁটে বেড়ায়, ওর মনে আগুন জ্বললে কেমন চুপচাপ থাকতে পারে দেখি!

পানাও চঞ্চল হয়ে উঠলো। জারা-নাচকে দূরে রেখে অধৈর্য হয়ে গাছগাছালির ভিড়ে পায়চারি করে বেড়ালো ও। ঘুরলো ঝোপেঝাড়ে আনাচে-কানাচে।

পাকা মহুয়ার সুবাস ভেসে আসছে দূর থেকে। নাচ আর চিৎকার—দূর-বনের পশুপাখিদের চিৎকার থামলে হয়তো মৌমাছির গুঞ্জনও শোনা যেতো। কয়েকটা বাদুড় পাখা ঝটপট করে গাছের শাখা থেকে উড়ে পালালো। দু-চারটে পাকা মহুয়া পড়লো টপটপ করে, পানা মান্‌কির পায়ে। সমস্ত গাছতলাটা ঝরা-মহুয়ায় ছেয়ে গেছে। পায়ে ঠেলে সামান্য একটু জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসলো পানা। কয়েকটা কুড়িয়ে

নিয়ে মুখে পুরলো। বা! বেশ পেকেছে তো? কালই এক হাঁড়ি মদ চোলাই করতে হবে।

মদ যখন হবে তখন হবে। এখন এক ছিলিম চড়িয়ে নিতে দোষ কি। ছোট্টো কলকেটা ট্যাঁক থেকে বের করে চকমকি ঠুকতে শুরু করলো পানা। কিন্তু ধরানো আর হলো না।

দূরে একা দাঁড়িয়ে আছে গাছে ঠেস দিয়ে, সাণ্ডিটা কে বটেক! জারায় যায় নি? না, আকুম তো নয়!

চকমকি ঠুকে সোলা আর ধরানো হলো না। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো ও, এগিয়ে গেলো ছায়াশরীরটার দিকে।

কলকে আর চকমকি আবার ট্যাঁকে গুঁজে রাখলে।

সুখন? হ্যাঁ, সুখনই তো।

—কে খাড়া রয়েছিস রে উধার পানে? সুখন বটিস?

চমকে ফিরে তাকালো সুখন। তারপর ঘুম-ভাঙন্ত শরীরের মতো আড়মোড়া ভেঙে এগিয়ে এলো।

—জারা-নাচে যাস নাই ক্যানে?

মাথা হেঁট করে চুপ করে রইলো সুখন।

উত্তর না পেয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠলো পানা। ভেবেছিলো, ওর অসম্মান করেছে গাসি তাই সুখনও জারায় যায় নি। তা নয় তা হলে?

চটে গিয়ে বললে, মুখে কি রড় নাই?

সুখন তেমনি মাথা হেঁট করেই থাকলো। মেজাজ ভালো নেই তার।

—সাণ্ডি-জোয়ান বয়েস। মেজাজ ভালো নাই কি? তা মেজাজ তো আমারও বিগড়ে দিয়েছে গাসি। আয়, বোস ইখানটায়। বলে বসে পড়লো পানা।

সুখনও বসলো।

পানা এবার হাসলো সুখনের মুখের দিকে চেয়ে। বললে, বিয়াসাদী না করলে এমন উমরে মন বিগড়ে তো যাবেই।

—ঠিগিয়া নাই তো বাপ্‌লা! দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে যেন অভিমানও ফুটে উঠলো ওর কণ্ঠস্বরে। অর্থাৎ বাগদানই হলো না, বিয়ে!

—ঠিগিয়া নাই?

—না মান্‌কি।

—ক্যানে?

বিষণ্ণ হাসি হাসলো সুখন।—হুঁ। বললাম একটো কথা।

—পীরিত হইছে বুঝি? রসিকতা করলে পানা।

সঙ্গে সঙ্গে হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সুখন।

সেকি! সাণ্ডি-জোয়ান একটা ছেলে কাঁদে কেন এমন করে? বিস্মিত হলো পানা মান্‌কি। অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথাই বললো না। চুপচাপ কাটলো।

তারপর একে একে সব ঘটনাটা খুলে বললো সুখন। আর বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো ও আবার।

—হুঁ। বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললে পানা।

বুড়ো গাসি মুণ্ডার মেয়ে রাঙিনাকে ভালোবেসেছে সুখন। সকাল আর সন্ধ্যেয় গাড়ায় যখন জল আনতে যায় রাঙিনা তখন দূর থেকে রোজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতো সুখন। মাঝে মাঝে দু-একটা রসিকতাও করেছে সে। হেসে জবাবও দিয়েছে রাঙিনা।

বয়স যখন ছোটো ছিলো, সুখনের মনে পড়েছে কতোদিন, সেই সিল্লির গাড়ায় সাঁতার কেটে শালুক তুলে এনে দিয়েছে ও রাঙিনাকে। তখনও মেয়েদের ঘুম-ঘরে ঢোকে নি রাঙিনা, ওর মা বুড়ি লাপ্‌রির গায়ে গায়ে জড়িয়ে থাকতো সব সময়।

তারপর বড়ো হয়ে তো কতোদিন রাঙিনার খোঁপায় ফুল গুঁজে দিয়েছে ও। খিলখিল করে হেসে উঠেই এপাশ ওপাশ তাকিয়ে

দেখেছে রাঙিনা, কেউ দেখছে কিনা। সে-সব দিনের কথা স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেলো কেমন করে ? সেই পুরানো ডেরা ছেড়ে দলকে দল চলে এলো লাপরার এই নতুন পত্তনে, আর এই ফাঁকে কখন ওদের পরস্পরের মন জানাজানি পরিচ্ছেদ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

তবু সাহস করে আজ সকালেই নাকি রাঙিনাকে তার পিয়ারের কথা বলেছিলো সুখন, আর তা শুনে খিলখিল করে সশব্দে হেসে উঠে সুখনকে বিদ্রূপ করেছে সে। ওরার আরো পাঁচটা মেয়েকে ডেকে সুখনের কথাগুলো আবৃত্তি করেছে বার বার। আর প্রতি-বারই কৌতুকে হেসে গড়িয়ে পড়েছে সে।

সব শুনে পানা মান্‌কি হেসে উঠলো হো-হো করে।

—না, বাপের তেজ পেয়েছে বেটি, আর তুই একটা না-মরদ। জবাব দিবার পারলি নাই ?

অপমানে লজ্জায় চুপ করে রইলো সুখন। তারপর ধীরে ধীরে বললে, জবাব কি একটা তুব্‌লা কুড়িরে দিবার পারতাম নাই মান্‌কি ? কিন্তুক রাঙিনার মুখের পানে তাকালেই যে মনটো লরম হয়ে যায় বটে।

পানা মান্‌কি হাসলো।—তুব্‌লা জান তোর, মন তো লরম হবই। লরম জান লিয়ে পিয়ার হয় না, বুঝলি ?

বিস্ময়ে মুখ তুলে তাকালো এবার সুখন। এ আবার কি কথা! পিয়ার করতে হলে তো মনকে নরমই করতে হয়।

—মজবুত জান লিয়ে একটো কাজ করতে পারিস তো রাঙিনা পায়ে লুটায় পড়বে। পারবি ? প্রশ্ন করলো পানা।

—পারবো। কি করতে হবে, খুন করতে হবে গাসিকে ?

হাসলো পানা।—না। মেয়াদের বশ করার মন্ত্র জানি আমি। শিখায়ে দিবো তোরে। কিন্তু বড়ো কঠিন কাম। পারবি তুই ?

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো সুখন।

—উঁহুঁ। ছুব্‌লা জান তোর, ছাতি চওড়া হলে কি হবে। পারবি নাই তু।

—পারবো মান্‌কি, পারবো। পা জড়িয়ে ধরলো সুখন।—মন্ত্রটা শিখায় দিলেই পারবো।

—রাঙিনার মুখের দিকে তাকালেই কবুতরের মতো নরম হয়ে যাস তুই।

—নরম হবো নাই আর, কি করতে হবে, কি এমন কঠিন কাম!

এবার তীব্র চোখে তাকালো পানা সুখনের মুখের দিকে, এক-দৃষ্টে রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে রইলো। তারপর হঠাৎ খপ্‌ করে সুখনের হাত ধরে কাছে টেনে এনে ফিসফিস করে বললে, শুধু মন্তর নয়। জবরদস্তি ধরম নষ্ট করতে হবে রাঙিনার। তারপর তার কাপড়টা কাড়ে এনে জ্বালায় দিতে হবে মসানদিরির উপরে। পারবি তুই?

ভয়ে কেঁপে উঠলো সুখন।—না মান্‌কি, না। রাঙিনার ধরম নষ্ট করবো আমি?

গাঁজার কলকেয় একটা টান দিয়ে সুখনের মুখের দিকে ধোঁয়া ছাড়লো পানা। খুক্‌খুক্‌ করে কাশতে শুরু করলো সে। আর মুচকি মুচকি হাসলে পানা।

বললে, জানি রে বেটা, তুই পারবি না এ-কাম। হুঁ, মরদ ছিলো বটে গাসি। গাসিকে প্রথমে তাড়ায় দিছিলো লাপ্‌রি।

—হুঁ? উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো সুখন।

—হাঁ। তামাড়ের এক সাধু গোঁসাই দিছিলো এ-মন্তর।

—সাধু গোঁসাইয়ের মন্তর? এগিয়ে এলো সুখন, আগ্রহে, আনন্দে।—সত্যি বটে?

পরীরা হলো স্বর্গের দেবতাদের বড়ো আদরের মেয়ে। স্বর্গেই থাকতো তারা, নাচতো গাইত্তো খেলা করতো ফুল-বাগানে। পৌষ-পরবের ছোট্টো ফুলবাগিচা নয় সে। এমনি বনের মতো বড়ো-বড়ো ফুলবাগিচা। তার আরম্ভ নেই, শেষ নেই। যতদূর চোখ যায়, শুধুই ফুল আর ফুল। কোথাও এতোটুকু মাটি দেখা যায় না, লাল-লাল আগুনের মতো ফুলের রাজ্য হলো স্বর্গরাজ্য। পরীরা হলো দেবতাদের বেটি, পেয়ারের মেয়ে। দেবতারা তো আর মানুষ নয়, তাই মানুষের চেয়ে বেশি মায়া-দয়া তাদের বুকে। মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে সব ভুলে যেতো দেবতারা, সব সময়ই ভয় পেতো পরীদের বুঝি কষ্ট হয়, অসুবিধে হয় চলা-ফেরা করতে। তাই স্বর্গের সব মাটি ঢেকে দিয়েছিলো দেবতারা আগুনের মতো লাল ফুল দিয়ে। পাছে পরীদের পায়ে আঘাত লাগে, কষ্ট হয় মাটিতে চলা-ফেরা করতে। ফুলের পাপড়ি মাড়িয়ে চলতো-ফিরতো তারা।

আদরের মেয়ে, তার ওপর স্বয়ং দেবতাদের। যখন যা বাহানা ধরতো তারা, তৎক্ষনাৎ পেয়ে যেতো। তাদের মুখের দিকে চেয়ে কি 'না' বলা যায়? মানুষের এমন পাথরের হৃদয়, সে-ই মেয়ের হাসিতে ভুলে যায়, দেবতারা তো ভুলবেই।

সে কী রূপ পরীদের! স্বর্গ ছাড়া আর কোথাও এমন রূপ এমন সুরত দেখা যায় না। সে রূপের তারিফ এক দেবতাদের সভাতেই চলে। সে সৌন্দর্যের জলুসেই চাঁদে অমন চাঁদির আলো ঠিকরে পড়ে। চাঁদই হলো স্বর্গ; ওখানে অতো-অতো পরী ঘোরাফেরা করে বলেই এতো আলো। আর ঐ আলো এসে

পড়ছে বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পাহাড়ে। পরীরা সব এক একটা চাঁদের টুকরো। একটা গাছে আগুন লাগলে কতোটুকু আর আলো হয়। সব গাছে আগুন লেগেছে বলেই না জারা জ্বলছে। লাল হয়ে উঠেছে চতুর্দিক। চাঁদও তাই, অনেক পরী এক জায়গায় মিলেছে বলেই এতো আলো।

হঠাৎ একদিন হলো কি, এই চাঁদের টুকরোরা তাদের বাপমায়ের কাছে বাহানা করলে, দুনিয়া দেখতে আসবে। টাংরোটোলির যে পাহাড়, তার ওপরে উঠেও যে মেঘ, যে মেঘের ওপারে আর চোখ যায় না, তারও অনেক অনেক ওপরে হলো স্বর্গ। অতো উঁচু থেকে তো আর দুনিয়া দেখা যায় না, তাই দেওতাদের মেয়েরা বাহানা ধরলে: মাটি দেখি নি কখনো, পাহাড় দেখি নি, দুনিয়ায় বেড়াতে যাবো আমরা। পৃথিবীর মানুষগুলো কেমন ধরনের দেখে আসবো।

কিন্তু অতো উঁচু থেকে নামবে কি করে পরীরা। দেবতারা ইচ্ছে হলেই পৃথিবীতে নেমে আসতে পারে। তা বলে মেয়েগুলো তো আর দেবী নয়, দেবদেবীদের মেয়ে শুধু। তারা যখন দেবদেবী হবে তখন তারাও পারবে। কিন্তু কুড়ী তো তারা এখনো, বিয়া-সাদী হয় নি। আর সে-কথা বলে তো মেয়েদের ফিরিয়েও দিতে পারে না দেবতারা।

কি করা যায়! অনেক ভাবলো তারা। তারপর বড়ো লোহারকে ডাকলে। বড়ো লোহার যা দরকার তাই বানিয়ে দিতে পারে এক নিমেষে। সব শুনলো সে এসে। বললে, ঠিক আছে। একটা সিঁড়ি বানিয়ে দিচ্ছি স্বর্গ থেকে পৃথিবী অবধি। কিন্তু এতো বড়ো সিঁড়ি, এতো লম্বা সিঁড়ি বানাতে হলে অনেক ধরম্ দিতে হবে, অনেক পুণ্য দিতে হবে। দুনিয়ায় যেমন নাহেল বানাতে হলে লোহারকে ধান দিতে হয়, নয়তো মকাই, তেমনি স্বর্গে দিতে হয় ধরম্। কিন্তু ওরা সব ছোটো—ছোটো দেবতা, অতো পুণ্য দেবে কি

করে তারা। তাই মহাদেওয়ের কাছে ছুটলো সব দেওতারা। প্রার্থনা জানালে, স্বর্গ থেকে দুনিয়া অবধি একটা সিঁড়ি বানাবার জন্যে একটু পুণ্য চাই। পরীরা সব দুনিয়া দেখতে যাবে।

মহাদেও শুনলেন সব। প্রার্থনা শুনে চুপ করে রইলেন। তারপর হঠাৎ চোখ মেলে তাকিয়ে হাসলেন তিনি। বললেন, তোমরা না স্বর্গের দেওতা সব? তোমাদের মাথায় এতোটুকু বুদ্ধি নেই?

বুঝতে না পেরে মাথা নিচু করলো দেবতারা।

মহাদেও বললেন, পরীদের জন্যে সিঁড়ি গড়তে চাইছো দুনিয়া অবধি। যে সিঁড়ি দিয়ে পরীরা যাবে দুনিয়া দেখতে, সেই সিঁড়ি দিয়ে যে পিলপিল করে দুনিয়ার মানুষগুলো উঠে আসবে। পাপীতে ভরে যাবে স্বর্গ। রুখবে কি করে তাদের? তখন আর কেউ সাধু হবে, না সাধনা করবে? কেউ আর ভোক্তা হবে না, ফুলকুদ্‌না করবে না, সারনাতেও যাবে না কেউ।

ঠিক তো। এটুকু আর মাথায় ঢোকে নি? মেয়েদের আদুরে-আদুরে বায়না শুনে বুদ্ধিও লোপ পেলো নাকি। কি করা যায়। ফিরে গেলেই তো ছেঁকে ধরবে সব। কি বলে ঠাণ্ডা করবে তাদের? তাই, কথা শুনেও ফিরতে চাইলো না দেবতারা। ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। এদিকে বলতেও সাহস পায় না, মহাদেও আপনিই একটা সুরাহা করে দিন।

বুঝতে পেরে হাসলেন মহাদেও। বললেন, তোমরা আমার গিদ্‌রা-গিদ্‌রা। তোমরা যখন প্রার্থনা জানিয়েছো, তখন সুরাহা একটা হবেই। তবে সিঁড়ি বানানো চলবে না। বরং যারা দুনিয়া দেখতে চায়, তাদের সব পাখির মতো ডানা হবে। উড়তে উড়তে নেমে যাবে পৃথিবীতে, আবার উড়তে উড়তে ফিরে আসবে। দুনিয়ার লোকও দূর থেকে দেখে ভাববে কবুতর উড়ছে।

এমনি করে ডানা হলো পরীদের।

তারপর থেকে রাত হলেই রোজ ঝাঁক-ঝাঁক পরী উড়তে উড়তে নেমে যেতো পৃথিবীতে। আবার ভোর হবার আগেই পালিয়ে আসতো।

এদিকে পাঁচ গাঁওয়ের এক মান্‌কির ছেলে ছিলো জবর শিকারী। হাতে আ-আপাড়ি নিয়ে বনে জঙ্গল ঘুরে বেড়ানোই ছিলো তার কাজ। রাতের অন্ধকারেও সে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতো। এমনিভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন পিয়াসে ছাতি ফেটে যাবার উপক্রম হলো তার। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথে ঘুরে ঘুরে গাড়া খুঁজতে শুরু করলে। একটা ঝরনা খুঁজে পায় তো প্রাণ ভরে জল খেয়ে নেয়।

চাঁদনী রাত। চাঁদি গলে গলে পড়ছে যেন পাহাড়ের ওপর। মান্‌কির বেটা ভাবলে, চাঁদনী রাত তো এর আগেও হয়েছে, কিন্তু এমন চাঁদি গলে পড়তে তো আগে দেখি নি! এতো আলো কোত্থেকে আসছে? ব্যাপারটা কি দেখবার জন্যে এগিয়ে গেলো সে। কয়েক কদম এগিয়ে যেতেই দেখলে চমৎকার একটা ঝরনা কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে। ঝরনার পারে গিয়ে ছাতি ভরে জল খেলো সে। কী ঠাণ্ডা আর মিঠা জল! খেয়ে প্রাণ জুড়িয়ে গেলো তার। ভাবলে, ঘুরে ঘুরে তো দরদ হয়েছে পায়ে, বিশ্রাম করে নেয়া যাক কিছুক্ষণ।

ঝরনার ধারে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে রইলো সে। আর বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ দেখলে এক ঝাঁক সাদা ফুটফুটে কবুতর আকাশে উড়ছে। শিকারের লোভ হলো মান্‌কির বেটার, তীর-ধনুক বাগিয়ে ধরলো সে। কিন্তু টিপ-নিশান লাগিয়ে যেই তীর ছুঁড়তে যাবে অমনি মায়া হলো মান্‌কির বেটার। আহা, এতো সুন্দর কবুতরের ঝাঁক, কখনো দেখে নি এর আগে। এমন নরম বুকে তীর ছুঁড়ে খুন বের করবে সে! না, খাওয়া তো তার হয়েই গেছে। কি হবে কবুতর মেরে। তীর নামিয়ে, সেদিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলো সে। তেমনি গুঁড়ির গায়ে ঠেস

দিয়ে। এদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাজ্জব ব্যাপার। কবুতরের ঝাঁক যতো নিচে নামে ততোই তাজ্জব হয় সে। এতো বড়ো কোনো চিড়িয়া তো দেখে নি সে এর আগে।

পরীর দল যখন ঝরনার ওধারে এসে নামলো তখন বুঝলো সে ব্যাপারটা। মান্‌কির বেটাকে পরীদের কেউই দেখতে পেলো না। তারা আপন মনে নাচলো গাইলো। তারপর সবাই তারা একে-একে ডানা খুলে রাখলে একটা শালগাছের গায়ে। পরীদের দলে ছিলো পরীদের রানী। তার পিছনে পিছনে সারি বেঁধে গাইতে গাইতে ঝরনার পথে এসে নামলো তারা। আর তাদের রূপ দেখে পাগল হয়ে গেলো মান্‌কির বেটা। ডানা খুলে রাখতেই পরীদের রানীর সমস্ত শরীরটা সামনে জ্বলে উঠলো তার। কাঁধ বেয়ে পা পর্যন্ত লুটিয়ে পড়েছে রেশমী চুল, চোখে হীরার টুক্‌রা, সেঙ্গেল কুসুমের মতো লাল ঠোঁটে হাসির ঝিলিক। কী তার সুরত, কী চিক্‌নাই, মুখে নিমঝিম নিমক চমকায়।

একদিন দেখেই নেশা হয়ে গেলো মান্‌কির বেটার। সাঁঝ হতে না হতে রোজ এসে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে সে পরীদের নাচ, গান শোনে, আর রানীর সুরত দেখে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

এমনি করে রানীর ওপর পিয়ার পড়ে গেলো তার। কিন্তু পরীদের রানী তো আর দেখতে পায় না। দেখা দিতে সাহসও হয় না মান্‌কির বেটার, পাছে উড়ে পালিয়ে যায়।

সারাটা দিন, সেই ভোর সকাল থেকে সন্ধ্যেবেলার যখন সূরয বোঙা পাহাড়ের গুহার ভেতর লুকিয়ে পড়ে, তখন অবধি এখান-সেখান করে ঘুরে বেড়ায় মান্‌কির বেটা। কোনোদিন হয়তো শিকার করে, কোনোদিন বা ভুখপিয়াসের কথাই ভুলে যায়। কিন্তু মনে তার একটাই পিয়াস, একটাই ভাবনা। তাই সন্ধ্যে হবার পর যেই দেখে চাঁদ দেখা দিয়েছে আকাশে, অমনি ঝরনার ধারে এসে লুকিয়ে বসে থাকে সে গাছের আড়ালে। তারপর পরীরা আসে,

পরীদের রানী আসে, নাচে গান গায় খেলা করে ডানা খুলে রেখে, সাঁতার কাটে ঝরনার জলে। মান্‌কির বেটাও সারা রাত জেগে দেখে তাদের চাঁদের টুকরোর মতো সুরত। সে রূপ শুধু তাদের শরীরের রূপ, রঙদার সুতির কাপড় পরে জলুস আনতে হয় না তাদের, নাকে নথ কানে ঝিকাচিল্লি লাগিয়ে, হাতে চাঁদির কঙ্‌না লাগিয়ে রূপ বাড়াতে হয় না তাদের ছুনিয়ার ঝুটাসুরত মেয়েদের মতো। তাই সে-পরীদের দেখে নিদ্‌ ভুলে যায় তার চোখ। সারা রাত শুধু জেগে জেগে কাটায় সে।

দিনের পর দিন এমনি ভাবে রাত জেগে জেগে ক্লান্ত হয়ে পড়লো মান্‌কির বেটা, শরীর তার ছুবলা হয়ে গেলো চিড়িয়ার জানের মতো, হাতে আপাড়ি তোলবার শক্তিটুকুও যেন নেই আর। কতোদিন ভুখা কাটিয়েছে সে, কতোদিন ঘুম হয় নি। আর যেন হাঁটতে পারছে না। তাই পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে একটা গুহা খুঁজছিলো সে, সেখানে গিয়ে দিনকয়েক ঘুমিয়ে নিতে পারবে। ছুপুরের রোদ তখন সমস্ত পাহাড়টা ঝলসে দিচ্ছে, গাছপালার পাতা শুকিয়ে যাচ্ছে রোদ্দুরে। এমন সময় মান্‌কির বেটা শুনতে পেলো গুহার ভেতর থেকে যেন গুম্‌-গুম্‌ গুম্‌-গুম্‌ শব্দ ভেসে আসছে। কে যেন মন্ত্র পড়ছে বজ্রগম্ভীর স্বরে। শব্দ শুনে শুনে আন্দাজে গুহার দিকে এগিয়ে গেলো মান্‌কির বেটা, আর সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ ঝড় এলো পৃথিবী কাঁপিয়ে। সে কী ঝড়, গাছপালা ভেঙে পড়লো মড়মড় করে, মেঘ এলো পাগলা হাতির মতো শুঁড় তুলে, আর ভয়ে পালিয়ে গেলো সূর্য। অন্ধকার হয়ে গেলো চারিদিক, আর বৃষ্টি নামলো পাহাড় ভাসিয়ে। তবু বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে গুহার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো মান্‌কির বেটা।

গুম্‌-গুম্‌ গুম্‌-গুম্‌ শব্দ আসছে তখনও গুহার ভেতর থেকে। পা টিপে-টিপে এগিয়ে গেলো মান্‌কির বেটা, উঁকি মারলো গুহার ভেতর। যা দেখতে পেলো তাতেই তার চক্ষু স্থির। একটা

প্রদীপ জ্বলছে অন্ধকার গুহায়। আর কুমড়ু ডাকাতের মতো এক অসুর-চেহারার কালামুখ মন্ত্র পড়ছে। একটা মুর্দার পচা গন্ধ বেরুচ্ছে বিশ্রী। মান কির বেটা ভালো করে তাকিয়ে দেখলে আবার, মড়াটার ওপরই বসে আছে সেই কালামুখ। আর মাঝে মাঝে হাড়ের বাটিয়া করে মাণ্ডি পান করছে।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো মানকির বেটা, হঠাৎ চোখ না খুলেই উঠে দাঁড়াতে দেখলো কালামুখকে, আর সঙ্গে সঙ্গে বাইরে পালিয়ে এসে দাঁড়ালো। কি করবে ঠিক করতে পারলো না।

এদিকে খট-খট খট-খট শব্দ এগিয়ে আসছে খড়মের, আর মন্ত্রধ্বনিও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কালামুখও তা হলে বাইরে বেরিয়ে আসছে। কি করবে মান্‌কির বেটা? পালাবে? কিন্তু এই ঝড়বৃষ্টি, এমন অন্ধকারে কোথায় যাবে সে। হঠাৎ এই সময় তার চোখে পড়লো বিরাট এক টুকরো মণি যেন একটু-একটু করে এগিয়ে আসছে। এতো অন্ধকারেও চাঁদের টুকরোর মতো জ্বলছে যখন, তখন নিশ্চয়ই ওটা সাপের মণি। এই সময় বিজলী চমক দিলো, আর একটা বিরাট অজগর ফণা দোলাতে দোলাতে এগিয়ে আসছে দেখতে পেলো সে। এদিকে কালামুখও তখন চোখ বুজেই দু-হাতে একটা নরকপাল ধরে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। মান্‌কির বেটা দেখলে, আর সময় দিলেই অজগরটা কালামুখকে গিলে ফেলবে। কিন্তু কাকে মারবে সে, ভাবলে এক মুহূর্ত। কালামুখ মুর্দার ওপর বসে মন্ত্র পড়ে, মানুষ বলি দেয়, ওড়া থেকে কুড়িদের মন্ত্র পড়ে ধরে নিয়ে যায়। আর অজগর হলো পাহাড়ী মানুষের প্রধান শত্রু। চোখের দৃষ্টিতে কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে গিলে ফেলে। হঠাৎ মান্‌কির বেটা ভাবলে, যাই হোক্, কালামুখ হলো মানুষ, আর অজগর তো সাপ। মানুষকেই বাঁচাতে হবে। এই ভেবে ধনুক তুলে ধরলো সে, আর অন্ধকারেই মণি লক্ষ্য করে ছুঁড়লো তীর।

সে কী চিৎকার! যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে সারনার বুড়ো বটের মতো প্রকাণ্ড লেজটা, আর চিৎকার করছে সাপের মুখ। আবার বিজলী চমক দিতেই দেখা গেলো, সাপের ফণাটা দূরে ছিট্‌কে পড়েছে।

চিৎকার শুনে চোখ চেয়ে তাকালো কালামুখ। আর সে-চোখের দিকে তাকিয়ে ঠক্-ঠক্ করে পা কেঁপে উঠলো মান্‌কির বেটার। চোখ তো নয়, যেন দুটো পাহাড়ে জারা জ্বলছে পাশাপাশি।

আগুনের ভাঁটার মতো চোখ হলে কি হবে, কালামুখ বুঝলো মান্‌কির বেটা তার প্রাণ বাঁচিয়েছে।

তাই বললে, এই অজগর ছিলো আমার দুষমণ। আমার সাধনায় সিদ্ধি হয়েছে অজগর মারা যাওয়াতে। আমার জান নিতে শয়তান ওকে পাঠিয়েছিলো। তোর সাহসে আমি খুব খুশী হয়েছি। কি চাস্ তুই বল, তাই পাবি।

মান্‌কির বেটা প্রথমে কথাই বলতে পারে না। যখন বুঝলো কালামুখ সত্যিই বর দিতে রাজী হয়েছে, তখন বললে, পিতাজী, তুমিও আমার প্রাণ দাও।

প্রাণ? প্রাণ তো রয়েছে মান্‌কির বেটার। তাই উৎসুক হয়ে ব্যাপারটা জানতে চাইলো কালামুখ।

মান্‌কির বেটাও খুলে বললে তার পিয়ারের কথা। পরীদের, পরীদের রানীর কথা।

বললে, পরীদের ঐ রানীকে না পেলে জীবন আমার বরবাদ হয়ে যাবে।

কালামুখ বললে, বেশ, পরী বশ করার মন্ত্র তোকে আমি শিখিয়ে দোবো। কিন্তু শুধু মন্ত্রে তো কাজ হবে না, কাজ করতে হবে। সাহস হবে তো তোর?

মান্‌কির বেটা বললে, ডরপুক তো নই পিতাজী, তা হলে কি অজগর মারতে পারতাম!

—তবে শোন্। পরীরা যখন পাহাড়ে নামে তখন দেখবি একটা গাছের গায়ে পরীদের রানী ডানা দুটো খুলে রাখে, আর অন্য গাছের গায়ে আর সব পরীদের ডানা থাকে। তুই করবি কি, রানীর ডানা যে গাছে রাখে তার নিচে মাটি খুঁড়ে একটা ঘর করে নিবি। তার নিচে লুকিয়ে থাকবি তুই, আর গুঁড়ির কাছে ছোটো, একটা ফুটো রাখবি। রানী যেই ডানা রেখে জলে নামবে, অমনি নিচে থেকে ডানায় আগুন লাগিয়ে দিবি তুই। আগুন দেখে সব পরীরা তাড়াতাড়ি উঠে এসে উড়ে পালাবে, রানী আর উঠতেও পারবে না, উড়তেও পারবে না। তুই তখন বেরিয়ে আসবি বাইরে, আর লজ্জায় জল ছেড়ে উঠতে চাইবে না রানী। দুনিয়ার মানুষের সামনে নাঙ্গা শরীর নিয়ে আসবে কি করে সে! শরম লাগবে না? তখন তুইও জলে নেমে জোর করে ধরে আনবি তাকে। ওরা হলো স্বর্গের পরী, ধরম্ নষ্ট হলে আর পরী থাকবে না ও। ঠিক-ঠিক যা বললাম তাই করবি, তারপর একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি, এটা পড়বি আর ডানাপোড়ার ছাই নিয়ে এসে সসানদিরিতে ছড়িয়ে দিবি। তা হলেই পরীদের রানীও বশ মানবে। পালাবার চেষ্টা করবে না।

এই বলে মান্‌কির বেটাকে শিখিয়ে দিলো কালামুখ।

মান্‌কির বেটাও ঠিক-ঠিক করলো যেমন বলেছিলো কালামুখ। মান্‌কির বেটা সে, তার ওপর জবর শিকারী। ডরপুক তো নয় যে ভয় পাবে। ছাই ছড়িয়ে মন্ত্র পড়ে আসার পর পরীদের রানী আর সেই মান্‌কির বেটার কাছ থেকে উঠে যেতে চাইতো না এক নিমিষের জন্যে।

কল্‌কেতে আরেক ছিলিম গাঁজা চড়ালে পানা মান্‌কি। তারপর সুখনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়েঁ ফিসফিস করে বললে, সেই মান্‌কির বেটাকে দেখেছিলো আমার গর্ম আয়ু। ঠাকুমা বলেছিলো আমার, পরীদের রানীর নাতনীর মতোই দেখতে সে মেয়েকে। তামাড়ে থাকতো তারা।

তারপর একটু থেমে আবার ফিসফিস করে বললে, বুণ্ডুর এক সাধুবাবা আমাকেও শিখিয়ে দিয়েছিলো মন্ত্রটা।

—হুঁ ? আশায় বিস্ময়ে কপালে চোখ তুললো সুখন।

মাথা দুললো পানার।—উঝাং ছত্রী আর আমি, শুধু দু-জনই জানে এ-মন্ত্র। এই মন্ত্র দিয়েই লাপ্‌রিকে বশ করেছিলো গাসি মুণ্ডা।

পরী বশ হয় এই মন্ত্রে ? অবিশ্বাসের একটু ছোঁয়া ছিলো যেন সুখনের প্রশ্নে।

পানা মান্‌কি সামনে পিছনে মাথা দোলালে।

পানা বেশ বুঝতে পারলো, বিশ্বাস ঠিকই হয়েছে সুখনের, শুধু ওর চোখ দুটোই বিশ্বাস করতে চাইছে না। মন তৈরী হয়েই আছে মন্ত্রটা জানবার জন্যে।

বললে, হয় হয়। নিজেই দেখ না কেনে। তবে হ্যাঁ, সাহস চাই। সেরমা চাঁদোকে খুশী করতে হলে মুর্গী বলি দিতে হয়, মুর্গী মারতে যে ভয় পায় সে খুশী করবে কি করে।

—সাহস আছে আমার, দে মান্‌কি মন্ত্রটা শিখায়ে দে।

হাসলে পানা।—শুধু মন্ত্রে তো কাজ হবে না। দেওতাকে খুশী করতে হলে ঠিক্‌-ঠিক্‌ রীতগুলানও মানতে হবে। জবরদস্তি

ধরম্ নষ্ট করতে হবে রাঙিনার, তারপর উয়ার কাপড়টা পুড়ায় দিতে হবে সসানদিরির উপর।

—আর ?

—শিখায়ে দিবো তোরে। কাল আসে দেখা করবি ইখানে, সব শিখায়ে দিবো।

উঠে দাঁড়ালো পানা। সুখনও সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লো।

পানা বললে, যা ডেরায় যা, কাল আসবি ইখানে।

ডেরার পথ ধরলো সুখন। সামান্য কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, কাল আসবো কিন্তুক, কাল ঠিক আসবো।

মনে মনে সাফল্যের হাসি হাসলে পানা। তারপর বনের পথ ধরলো।

শুধুই কি সুখন, পানা নিজেও বোধহয় ঘুমোতে পারবে না আজ। শাল মহুয়ার ঘন বনের পথ পার হয়ে, অন্ধকার সারনার চত্বর পার হয়ে গাড়ার দিকে যেতে যেতে হঠাৎ খুশীতে ভরে উঠলো ওর মন। সত্যি মিথ্যে মিশিয়ে বেশ একটা গল্প শুনিয়ে দিয়েছে সে। গাসি মুণ্ডা যেমন ওর মান্‌কিয়ানার অপমান করেছে তেমনি সুখনকে দিয়ে গাসিরও মান মিশিয়ে দেবে ও মাটিতে। আর এইভাবে দলের এক একজন সাঙাকে নিজের তরফে টেনে নেবে পানা।

বুক-চুপ-চুপ অন্ধকারে সারনার বেদীটার কাছে পৌঁছতেই মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো পানার। বুড়ো বট হলো বনের রাজা। বনের রাজাই বটে। এক বিঘে জায়গা জুড়ে পাতার ছাউনী, বটপাতার চাঁদোয়ার ফাঁক দিয়ে আকাশের একটা তারাও বুঝি বা উঁকি দিচ্ছে না। সামনে পথ আছে কি নেই বোঝা দায়। বটের ঝুড়ি নেমেছে হাজার হাজার, কয়েকটা গিয়ে পড়েছে গাড়ার জলে। অন্ধকারে দশমুণ্ডা রাক্ষসের মতো দেখায় যেন বটগাছটাকে।

নোংখার রাজা দশমুণ্ডার গল্প শুনেছে পানা। অজগর যেমন গাছের গুঁড়ির মতো নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে শিকার ধরবার জন্যে, তেমনি বটগাছের রূপ নিয়েই যেন দাঁড়িয়ে আছে দশমুণ্ডা রাক্ষস।

না, দশমুণ্ডাকে ভয় নেই পানার। সারনায় স্বয়ং মহাদেও আছেন, গ্রামকে—গ্রামের লোকদের রক্ষা করবেন তিনি।

সারনা, সসান, ওরা, গাড়া,
মুণ্ডা গাঁয়ের চার কিনারা।

মনে মনে ছড়াটা আওড়ালে পানা। গাঁ রক্ষা করবার জন্যে চার কোণে চারটে পাহাড়াদার। একদিকে মহাদেব, অন্যদিকে শ্মশানদেবতা। একদিকে নদীর জল, আর একদিকে সাণ্ডি পুরুষদের ঘুম-ঘর। যদি শত্রু আসে টাঙি আর তীর-ধনুক নিয়ে মেরে তাড়াবে সাণ্ডি জোয়ানের দল।

বুড়ো বটের বেদীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ পানার মনে হলো, গাসি মুণ্ডা নেহাত ভুল বলে নি। তা হোক, ঠিক-বেঠিকের সওয়াল তো নয়, পানা মান্‌কির কথার ইজ্জত রাখলো না কেন গাসি। মন বোঝালেও গা ছম্-ছম্ করে উঠলো পানার। এই-মাত্র পাপের কথা বলে এসেছে সে সুখনকে, রাঙিনার ইজ্জত নষ্ট করার কথা বলে এসেছে।

কাল সকালেই এসে পুজো দিয়ে যাবে ও। গড় করে যাবে সারনার বেদীতে। আজ রাত্রে, এমন অন্ধকারে, সাহস হচ্ছে না বলেই না প্রণাম করতে পারছে না বেদী ছুঁয়ে!

তার চেয়ে এখন বরং একবার গাড়ার জলে স্নান করে নেবে। পাপ ধুয়ে যাবে তা হলেই।

এই ভেবে সারনা পার হয়ে গাড়ার দিকে এগিয়ে গেলো পানা। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো কারা যেন হাসছে, কথা বলছে।

খিলখিল মেয়ে-গলার হাসিটা যেদিক থেকে এলো সেদিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো পানা। ছায়া-ছায়া দুটো শরীর, একটা শুয়ে রয়েছে বড়ো এক শিলা পাথরটার ওপর, আর তার পাশেই হাঁটুভেঙে বসে আছে আরেকজন।

কে বটে? এমন জারার দিনে লুকিয়ে এসে পীরিতে মজে আছে? রাঙিনা! আকুম! চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীর রাগে জ্বলে উঠলো পানার।

খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলো, তারপর কাছে এগিয়ে এসে কড়া গলায় ধমক দিয়ে উঠলো।—আকুম!

চমকে চোখ তুলে পানা মান্‌কিকে দেখতে পেয়েই কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত বিস্ময়ে আর লজ্জায় দাঁড়িয়ে রইলো রাঙিনা, তারপর হঠাৎ ছুটে পালালো সারনার অন্ধকারে।

—আকুম! আবার কর্কশ ভৎর্সনার স্বরে ডাক দিলো পানা।

লজ্জায় শরমে মাথা নিচু করে কাছে এসে দাঁড়ালো আকুম। কথা বলতে পারলো না।

—কথাটা কি কয়েছিলাম তোরে?...জবাব দে ক্যানে, কয়েছিলাম কিটা?

—জারার নাচে তো গেলাম কৈ? অভিমানের স্বর ফুটলো যেন আকুমের গলায়।

—গাসি মুণ্ডা তোর দুষমন, কয়ে দিই নাই!

চোখ না তুলেই মাথা নাড়লে আকুম।

—তখুন?

উত্তর দিতে সাহস হলো না আকুমের। এ-লোকের সামনে কি উত্তরই বা দিতে পারে সে। গাসি মুণ্ডা ওর শত্রু হতে পারে, তা বলে রাঙিনাও কি শত্রু নাকি? তা হলে তো স্বর্গের দেবতারাও ওর দুষমন।

পানা তবু চুপ করলো না। বললে, গিতিওরার মেয়ে না

রাঙিনা? পাপের ডর নাই? ধরম্ নাই? ওরার কুড়িদের শরীরে বোঙা আছে জানিস নাই?

অনর্গল বকে গেলো পানা, আর একটা কথারও জবাব দিলো না আকুম। চুপ করে মাথা হেঁট করে শুনে গেলো শুধু।

কথার উত্তর না পেয়ে অধৈর্য আক্রোশে ফেটে পড়লো পানা। —পিয়ার করছিস তুই, বাপলা হবেক? কিল্লির মিল হবেক?

একটা ধাক্কা দিয়ে আকুমকে সরিয়ে দিলো বুড়ো পানা।—যা ডেরায় যা, পাপ করবিন না আর।

—না মান্‌কি, পাপ করবো নাই। মাফ কর তুই, পাপ করবো নাই।

পানা মান্‌কির ভয়ে সেই যে পালিয়ে এসেছিলো রাঙিনা, তারপর সারা রাত ঘুমোতে পারে নি ও। আশঙ্কা আর উৎকণ্ঠায় কেটেছে এক প্রহর। বাইরে জারার নাচ থেমেছে মাঝে মাঝে, ঢোলক আর বাঁশী চুপ করেছে। আর তখন হয়তো শুকনো পাতার শব্দ হয়েছে ওড়ার কাছেপিঠে, সঙ্গে সঙ্গে বুক কেঁপে উঠেছে রাঙিনার। ঐ বুঝি পানা মান্‌কির পায়ের শব্দ আসে।

চেষ্টা করেও বুঝতে পারে না রাঙিনা, কি এমন দোষ আকুমের সঙ্গে মিল্‌তি হলে। কিল্লিব মিল থাকলে পুরুষদের সঙ্গে মিলতে-মিশতে নিষেধ নেই, অথচ আকুমের সঙ্গে আড়াল হলেই পাপ হবে কেন? বিয়াসাদীর আগে পিয়ার হলে বোঙা খুশী হয়, ঠিগিয়া হলে বাপ মা খুশী হয় শুধু জাত গোত্র মিলে গেলেই, আর মিল নেই বলেই কি আকুমের সঙ্গে বাপলা হলে পাপ হবে?

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে চাটাইয়ে শুয়ে পড়েছিলো ও, গিতিওড়ার চাটাইয়ে।

গাঁয়ের মাঝখানে এই মেয়েদের ঘুম-ঘর, আর পুরুষদের গিতিওড়া হলো গাঁয়ের এক কোণে। ডিহির যতো কুমারী মেয়ে সন্ধ্যে হলেই এসে জমা হয় এই ঘুম-ঘরে। পাশাপাশি বসে কড়ি খেলে, গল্পগুজব করে, তারপর ঘুমোয় একসঙ্গে। ভোর হলেই আবার যে যার নিজের নিজের ঘরে বাপ-মায়ের ডেরায় চলে যায়। যে-সব সাথীদের বিয়ে হয় নি এখনো তারাও তেমনি ঘুমোয় তাদের ঘুম-ঘরে। ইচ্ছে হলেই তো আকুম চলে আসতে পারে এক ফাঁকে, কিন্তু ইচ্ছে হলেও রাঙিয়ার উপায় নেই ঘরের ঝাঁপি খুলে বাইরে বের হওয়ার। বিধবা বুড়ি খবর্দারনীর ঘুম ভেঙ্গে যায়

এতটুকু শব্দ হলেই। তা না হলে রাঙিনা চুপিচুপি গিয়ে জেনে আসতো আকুমের কাছ থেকে, বুড়ো পানা কি বলেছে তাকে। নাঃ। যা বলে বলুক গিয়া পানা বুড়া, উয়ার ও নেশাভাঙ্গের চক্ষুরে ডরায় না রাঙিনা।

কিন্তুক শব্দটা কিসের বটেক!

উঠে বসে রাঙিনা, অন্ধকারে ঠাহর পাবার জন্যে তাকায় এদিক-সেদিক। মেয়েগুলো সব জারা থেকে ফেরে নি এখনো। রুগী-ভুগী দু-চারজন কুড়ী-বুড়ি শুয়ে আছে লম্বা-লম্বা হয়ে। পাশে হাতরাতেই কার গায়ে পড়লো তার হাতখানা। মরার মতো পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে যমুনা।

কিন্তু শব্দটা ভেসে আসছে কোত্থেকে?

কান পেতে বেশ কিছুক্ষণ শুনলো রাঙিনা। কে যেন গুঙিয়ে গুঙিয়ে কাঁদছে।

উঠে দাঁড়ালো ও। পা টিপে-টিপে এগিয়ে গেলো যেদিক থেকে কান্না আসছে সেদিকে।

সেকি! ফুঁপিয়ে কাঁদছে ওড়ার মা বিধবা বুড়ি নান্‌কি।

ধীরে ধীরে পাশে বসলো রাঙিনা, নান্‌কি বুড়ির গায়ে হাত রাখলো। আগুনের হল্‌কা যেন গায়ে, হাত পুড়ে যাচ্ছে যেন। কি ব্যাপার। চুড়কিন ভর করলো নাকি ওড়া-আয়ুর শরীরে। ভূত পেত্নীর পাপ না ঢুকলে শরীরে আগুন জ্বলচে কেন?

রাঙিনা ধীরে ধীরে ডাকলো। আয়ু।

কোনো জবাব এলো না ডাকের। নান্‌কি বুড়ি তেমনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো; আর কাঁপলো থরথর করে।

তাই দেখে চোখ কপালে উঠলো রাঙিনার।—ওড়া-আয়ু, ওড়া-আয়ু! আবার ডাকলে ও।

এবারও উত্তর এলো না। সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে গেলো রাঙিনা। সমস্ত ঘরখানা ঘুটঘুট্টি অন্ধকার, এতোটুকু শব্দ নেই ঘরে, মড়ার

মতো পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে মেয়েগুলো। নিশ্চুপ গা-থমথম অন্ধকার শুধু। ওদিকের ছাউনীর ফুটো দিয়ে এক ফালি আলো এসে পড়েছে ঘরের এক কোণে। বাতাসেই কি গাছের পাতা নড়লো? ছায়াটা সরে গেলো তাই।

নিশ্বাস রোধ করে সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলো রাঙিনা। ছায়ার মতো কে যেন সরে গেলো না?

ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠলো রাঙিনা। কান পেতে শুনলো কে যেন ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে। শুকনো পাতা মাড়ানোর মতো আওয়াজ।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো রাঙিনা, ছুটে এসে ওড়ার ঝাঁপি খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেই ছুটলো ও, উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে শুরু করলে।

আর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো ভীতত্রস্ত গলায়। সমস্ত অন্ধকার ভেদ করে ফেটে পড়লো ওর ভয়চকিত চিৎকার।

—আয়ু! আপাং!

চিৎকার করতে করতে জারার দিকে ছুটে গেলো রাঙিনা। আর মনে হলো ওর, কে যেন ওর পিছনে পিছনে ধাওয়া করে চলেছে। অশরীরী কোনো পেতাত্মা যেন।

দলের ওঝা আর জনকয়েক লোক সঙ্গে নিয়ে রাঙিনা যখন ফিরে এলো তখন রাত কেটে ফরসা হয়ে এসেছে, সূর্য চমকাচ্ছে পুবের কোণে।

ওঝা এসে দেখলো বুড়ি নান্‌কি তখনও প্রলাপ বকছে নিজের মনে।

না। সাবধানে ঢুকতে হবে গিতিওড়ায়।

গুংরু ওঝা আর তার ছেলে লাটুয়া ওঝার দরজায় গোটাকয়েক পোড়া কাঠ রাখলো আড়াআড়ি করে। তারপর মন্ত্র পড়তে পড়তে একটা পুরোনো ঝাঁটা দিয়ে দাগ দিতে দিতে গুংরু

এগিয়ে গেলো যেখানটায় নান্‌কি বুড়ি শুয়ে আছে সেখান অবধি। আর লাটুয়া পিছনে পিছনে চললো। তিন পা হেঁটেই হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে দু-হাতে ভর দিয়ে পা দুটো ওপরে তুললো লাটুয়া। বাপের কাছ থেকে ওঝার বিদ্যে বেশ রপ্ত করে নিয়েছে সে! জুগিন চুড়কিন ভূত পেত্নী তাড়ানোর মন্ত্র জানা হয়ে গেছে। সাপের বিষ ঝাড়তে শিখেছে।

মাটিতে ঝাঁটা বোলাতে বোলাতে এগিয়ে গেলো গুংরু, মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে। তার পিছনে লাটুয়া—তিন পা হাঁটে, তারপর পা দুটো ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে হাতে ভর দিয়ে খানিকটা এগিয়ে যায়, আবার তিন পা হাঁটে, আবার খানিকটা হাতে ভর দিয়ে।

এমনি করে নান্‌কির কাছে এসে দাঁড়ালো দু-জনে। আর দু-জনেই জোরে জোরে মন্ত্র পড়তে শুরু করলো। বলা তো যায় না, কি হয়েছে নান্‌কির। কেন এতো বিড়বিড় করছে, কে বলতে পারে। মারাং গাড়ার জলের বিষ হতে পারে, জারার আগুনের বিষ হতে পারে, বোঙা চুড়িন হতে পারে। বিষই হোক বোঙাই হোক, সুযোগ পেলেই সে নান্‌কিকে ছেড়ে তাদের শরীরে ঢুকে পড়বে। তাই সারাক্ষণ মন্ত্রটা আওড়াতে হয়, যতক্ষণ না রোগের হদিস মিলছে।

খড়ি দিয়ে একটা গণ্ডি এঁকে দিলো গুংরু, নান্‌কির চারপাশে। ভূতপেত্নী গণ্ডির বাইরে না বেরিয়ে আসে।

আর লাটুয়া গুনতে বসে গেলো। কড়ি, নীল পাথর, ঝাঁটার কাঠি আর সারনার মাটি রাখলো গুংরু, নান্‌কির মাথার কাছে। তারপর মন্ত্র পড়তে পড়তে তার চারপাশে চক্র দিতে শুরু করলো।

এদিকে আঁকজোক চললো লাটুয়ার। অনেকক্ষণ পরে ডাক দিলো।—আপুং।

গুংরু ফিরে তাকালো।

—চুড়িন ভর করছে আপুং। জঙ্গলের ভেতর একটা শিমুল

গাছে ছিলো শয়তানী বোঙা, জারার আগুনে পালিয়ে এসে নান্‌কি বুড়ির ওপর ভর করেছে।

তাই নাকি। গুংরু ওঝার কটা-কটা চোখ দুটোয় চিন্তা নামলো। জারার জ্বলন সহ্য করতে না পেরে শয়তান কোন বোঙা এসে ভর করেছে নান্‌কির শরীরে।

পোড়া কাঠের চিহ্ন দিয়ে দিয়ে আবার আঁকজোক করতে শুরু করলো লাটুয়া। তারপর জানালে ব্যাপারটা। অনেক দিন আগে নাকি এই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একটা মুণ্ডার দল চলে গিয়েছিলো দূরের কোন পাহাড়ের দিকে। আর সেই সময়, একদিন রাত্তিরে মুণ্ডার দল ছাউনি ফেলেছিলো এখানে। লাটুয়া বললে, দলে ছিলো এক বেইমান পাপী। ঠিগিয়া হওয়া এক মেয়েকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলো লোকটা, আর মেয়ের বাপ জামাইকে হঠাৎ একদিন দেখতে পেয়ে ধারালো টাঙির এক কোপ দিয়েছিলো পাপীটার কাঁধে। তখন থেকে বেইমানটা শয়তানী বোঙা হয়ে বাস করছিলো জঙ্গলের একটা গাছে। জারার আগুনে পালিয়ে এসে ঢুকেছে নান্‌কি বুড়ির বুকের ভেতর।

শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে গুংরু।

বললে, নাগবন্দী করতে হবেক ঐ বোঙাটারে।

লাটুয়া সায় দিলে বললে, হ।

অন্য সবাই, অন্য অন্য মেয়েগুলোও ভয়ে বুকের কাছে হাত জড়ো করে দাঁড়িয়ে দেখছিলো। গুংরু ওঝা তখন ঝোলা থেকে মন্তর-তন্তরের কাঠি বের করে বিড়বিড় করতে করতে একবার আঁকজোক কাটা ঘরটায় রাখছে, একবার নান্‌কির মাথায় ঠেকাচ্ছে।

হঠাৎ এক সময় লাফ দিয়ে উঠলো গুংরু, কি একটা চিৎকার করে বললো যেন।

লাটুয়াও চিৎকার করে উত্তর দিলো।

গুংরু আবার হাঁকলে, এই বোঙা, নান্‌কি বুড়িকে ছেড়ে ভাগবি?

লাটুয়ার মুখ দিয়ে বোঙার উত্তর এলো, না, ভাগবো নাই।

একটা পুঁটলিতে বাঁধা ছিলো হলুদ। সেটা পুড়তে দিলো লাটুয়া।

বার বার তিনবার এমনি ধারা প্রশ্ন আর উত্তর চললো আবার। তারপর ঝাঁটার মাথায় কি কি সব জড়িবুটি লাগালে গুংরু। মন্ত্র পড়লে। তারপর পাগলের মতো মারতে শুরু করলো নান্‌কিকে, আর মাঝে মাঝে হলুদ পোড়াটা ধরে নান্‌কির নাকে।

প্রহারের যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো নান্‌কি। তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। এ সময় দয়ামায়া দেখালে চলে না। ভূত সুযোগ পাবে তা হলে। আবার মার চললো পুরোদমে। প্রলাপ বন্ধ হয়ে গেলো নান্‌কির। শুধু দেখা গেলো দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছে তার চোখ বেয়ে।

গুংরু হাসি মুখে বললে, ভূত পালায়ছে।

প্রলাপ যখন বন্ধ হয়েছে ভূত তখন পালিয়েছে নিঃসন্দেহ। কিন্তু রাঙিনা আর থাকতে পারলো না। ভিড় ঠেলে ছুটে এসে লুটিয়ে পড়লো ও নান্‌কির বুকের উপর।

চিৎকার করে ডাকলে, ওড়া আয়ু।

ওড়ার মা কোনো উত্তর দিলো না। উত্তর দেবে না আর বুঝতে পারলো রাঙিনা। গুমরে গুমরে কেঁদে উঠলো ও।

গুংরু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শুধু বললে, বোঙাটো বেইমান বটেক, নান্‌কির প্রাণটো লিয়ে পালায়ছে।

বনের মধ্যে বাস করতো কোন এক প্রেতাত্মা, জারার আগুনে গাছের শাখা ছেড়ে সে পালিয়ে এসে ঢুকে পড়েছিলো মেয়েদের ঘুম-ঘরের বিধবা বুড়ি নান্‌কির শরীরে। ওঝার মন্ত্র তাকে তাড়ালো বটে, কিন্তু যাবার সময় নান্‌কি বুড়ির আত্মাটাও নিয়ে পালালো সে।

নান্‌কি বুড়ি মারা গেলো। পঞ্চায়েতের মতে মারাং গাড়ার

খানিক দূরে 'সম্মান' ঠিক হলো, চিতায় চড়ানো হলো বুড়ির মৃতদেহ। দিনকয়েক পরে সেই চিতার জায়গাটায় মাটি ফেলে ফেলে একটা ঢিবি তৈরী হলো, একটা বেশ বড়োসড়ো পাথর এনে ফেললো গাঁয়ের লোক।

'সসানদিরি' পাথরটার ওপর চোখের জল ফেললো অনেকে, রাঙিনাও।

বুড়িকে ওড়ার অন্য সব মেয়েদের মতোই রাঙিনাও ভয় পেতো। তার চোখ ফাঁকি দিয়েই এসে মিলতে হতো আকুমের সঙ্গে। কিন্তু মনে-প্রাণে সকলেই ভালবাসতো বুড়িকে।

সসানদিরির পাশে বসে পুরোনো দিনের অনেক কথা মনে পড়েছে রাঙিনার, চোখ জলে ভিজে এসেছে তার।

দল বেঁধে সবাই যখন সিল্লির জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে যেতো, সেই তখনকার কথা।

একটা গাছের গুঁড়ির পাশে ওকে বসিয়ে রেখে রাঙিনার মা লাপরি বুড়ি চলে গেলো আর সকলের সঙ্গে। শুধু নান্‌কি বুড়ি আর দুটো বাচ্চা ছেলে গাছের পাতা ভাঙছিলো একটু দূরে। একমনে বসে বসে খেলা করছিলো রাঙিনা, কখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে বুঝতে পারে নি।

হঠাৎ ওর চোখ পড়লো পিছনে। একটা ভালুক এগিয়ে আসছে ওর দিকে। ভয়ে চিৎকার করে উঠলো ও। আর ওর চিৎকার শুনে জনকয়েক ছুটে এলো। কিন্তু ভালুকটাকে দেখেই পালাতে শুরু করলো তারা। শুধু নান্‌কি বুড়ি ঝাঁপিয়ে এসে ভালুকটার থাবার সামনে থেকে সরিয়ে দিলো রাঙিনাকে। তারপর ধস্তাধস্তি শুরু হল নান্‌কির সঙ্গে ভালুকটার।

পুরুষের দল যখন তীরধনুক টাঙি নিয়ে এসে ভালুকটাকে মারলো তখন নান্‌কি বুড়ির সারা গায়ে রক্ত। গলগল করে রক্ত ঝরছে চোখ থেকে।

ভালুকের থাবার নখে একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেলো নান্‌কির। তারপর থেকেই গিতিওড়ার মা হলো নান্‌কি বুড়ি।

ছোটোবেলার কথা, সব হয়তো স্পষ্ট মনেও পড়ে না রাঙিনার।

এমনি আরও কতো কথাই মনে পড়লো রঙিনার। সসানদিরির পাশে বসে চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো ওর।

দেখতে পেলো না গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখছিলো সুখন। সুখন আর পানা মান্‌কি।

সারনা পার হয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে পানা মান্‌কি বললে, মরদের কাম তুয়ার লয় রে। আকুমের সাথেই উয়ার বিয়া হবেক।

সুখনকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বললে, মন্তরটা তুই লিবি তো ক, বিলিয়া বেটাও গাসির বেটিটারে নজর দিঁয়েছে।

—বিলিয়া? চমকে চোখ তুললো সুখন।

পানা মান্‌কি জবাব দিলো না, মুচকি-মুচকি হাসলো শুধু।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুখন বললে, মন কইছে পাপ লাগবে।

পাপ? হো-হো করে হেসে উঠলো পানা। বৌয়ের নামে পত্তনটার নাম করলো লাপরা, পাপ লাগে নাই গাসির? চাঁহু বোঙা স্বপ্ন দিয়েঁছে বলে সারনা গাড়লো নিজের ওড়াঘরের কাছে, পাপ লাগে নাই তখুন? বুড়া উধমটারে খুঁটকাটহিদার করলো বেশি জমি পাবে বলে, পাপ হয় নাই গাসির?

সুখন হঠাৎ বললে, আকুম খুঁটকাটহিদার হইলে তো রাঙিনার সাথেই বিয়া দিতো গাসি!

—হঃ। অবিশ্বাসের শব্দ করলো পানা। মনে পড়লো আকুমকে ও নিজেই খুঁটিদার করতে চেয়েছিলো পঞ্চায়েতে। তাই বললে, গাসিটা লুভী বটে, ক্ষেতি বেশি লিবার দিকে নজর উয়ার। বেটির সাথে বিয়া দিলে তো আকুম জাঁওয়াই লাগতো বুড়ার, তখুন ক্ষেতি বাড়াই দিলে পঞ্চায়েত কইতো জাঁওয়াই খুঁটিদার আছে, ক্ষেতি বাড়াই দিছে।

বুকে থাপ্পড় মেরে পানা বললে, এ পানা বুড়া মান্‌কি বটেরে, বুদ্ধিটো মুণ্ডার চেয়ে বেশি বটে। খুঁটিদারের সাথে গাসি মুণ্ডা

তার বেটিয়ার বিয়া দিবে। হো-হো করে হাসলো পানা।—আর আকুমের সাথে! গাসি আর আকুম তো ভিন্‌ কিল্লি, ঠিগিয়ার কথাটো পাঞ্চায়েত মানবেক ক্যানে!

পঞ্চায়েত মানবে কেন? দলের বেশির ভাগই হল সাণ্ডিল কিল্লি। আর সব পারিশের ছেলেমেয়েদের বিয়ে হতে হবে ভিন্‌ পারিশে। ভিন্ন গোত্রে। কিন্তু সাণ্ডিলের বিয়ে হবে শুধু সাণ্ডিলের সঙ্গে। তাই রাঙিনার সঙ্গে বিয়ে হতে পারে না আকুমের। গাসি নিজে মত দিলেও হবে না। দলের মাথা হতে পারে গাসি, কিন্তু তারও তো বিট্‌লার ভয় আছে।

রাঙিনা আর আকুমের সে সব চিন্তা নাই। যৌবনের রঙিন চোখে তারা পরস্পরকে ভালবেসেছে। পঞ্চায়েত যদি মত না দেয় তো লাপ্‌রা ছেড়ে পালাবে দু-জনে। বন পার হয়ে, সিল্লির সেই গোহিন্দ গোঁসাইয়ের আখড়ায়।

কপালে তিলক এঁকে গোসাঁই হয়েছিলো গোহিন্দ। সোনাসিঁড়ি নদী পার হয়ে দেকোদের দেশে, অর্থাৎ হিন্দুদের দেশে চলে গিয়েছিলো গোহিন্দ। বহু বছর বাদে ফিরে এসেছিলো জাত ধরম বদল করে। আখড়া খুলেছিলা সিল্লিতে।

তারপর একে একে ওঁরাও সাঁওতাল মুণ্ডারা তার আখড়ায় জড়ো হচ্ছিলো, জাত ধরম বদল করছিলো। ক্ষেতিতে নাহাল দিয়েছিলো। তখন বুড়োরা মেরে তাড়ালো তাকে। বললে, বেটা-বেটিদের মন খারাপ করে দিচ্ছে গোহিন্দ।

গোহিন্দকে মেরে তাড়িয়েছিলো বটে, কিন্তু তার কদম সুবার গান মুছে দিতে পারলো না জোয়ানদের মন থেকে।

সাণ্ডিরা বললে, করম গাছের গান তো আমরাও গাই।

কুড়ীরা বললে, যম্‌না গাড়া তো আমাদেরই গাড়ার নাম।

বুড়োবুড়িরা বোঝাবার চেষ্টা করলে, যমুনা আর কদম তো ধর্ম নয়, ও হলো গাছ আর নদীর নাম। কিন্তু গোহিন্দ বোঙা-

দেবতাদের ভুলিয়ে নতুন ধরম আনতে চায়। দেকো অর্থাৎ হিন্দুদের ধরম আনতে চায়।

দেকো কি তুড়ুক তা বোঝে না জোয়ানগুলো। গান ভালো লেগেছে তাদের, তাই ধর্মও ভালো লেগেছে।

বুড়োবুড়িরা বুঝতে পারে নি, কি ভাবে ধীরে ধীরে তাদের ছেলেমেয়েদের মনে গোসাঁইয়ের ধর্ম ছাপ রেখে গেছে।

শুধু কি ধরম? পাপও শিখিয়েছে গোহিন্দ। বাপঠাকুরের কথা শুনে এসেছে তারা, মাটি হলো মা। মাটিতে তাই দেকোদের মতো লাঙল দিতে নাই। দিলে পাপ হয়।

তাই এতোদিন তারা শুধু ক্ষেতি বানিয়েছে বন পুড়িয়ে, তারপর বসে বসে হাতে মাটির ঢেলা ভেঙেছে, সার দিয়েছে। কিন্তু নাহাল চালায় নি। বৃষ্টির জলে মাটি ভিজে নরম হয়েছে যখন, তখন ঝুম রোপাই করেছে। অর্থাৎ ধানের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছে জমিতে। যেটুকু ফসল ফলেছে তাতেই খুশি হয়েছে। পাপ তো করে নি।

কিন্তু গোহিন্দ গোঁসাই দেকোদের কাছ থেকে নাহাল দেয়া শিখে এসে বলেছে, নাহাল দিলে ফসল বেশি হয়।

নিজে বলদ কিনে লাঙল দিয়েছে গোহিন্দ, ফসল পেয়েছে তিনগুণ। তা দেখে লুভী হয়ে উঠেছে জোয়ানগুলান।

বুড়োদের নিষেধ মানতে চায় নি অনেকে।

লাপ্ রায় এসে নতুন ক্ষেত বানানো হলো, খুঁটিদাররা মাপজোক করে জমি বিলিয়ে দিলো সকলকে। তারপর সবাই মন দিলো মাটি নরম করার দিকে। পাথুরে জমি, ভেঙে গুঁড়িয়ে গাড়ার জল এনে এনে ঢালতে শুরু করলো। মাটির চাঙর ভাঙে, আগাছা তোলে, আর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, কখন বৃষ্টি নামবে। এমনি ভাবেই ক্ষেতের কাজ চলছিলো দিনের পর দিন। পড়ে ছিলো শুধু পানা মান্কির ক্ষেত।

গাসি মুণ্ডা জিজ্ঞেস করেও কোনো উত্তর পায় নি পানার কাছ থেকে।

মনে মনে চটছিলো গাসি। তবু পঞ্চায়েতের ঝগড়া মনে রেখে সহ্য করছিলো। কাজিয়া করে লাভ নেই। দেখাই যাক না শেষ পর্যন্ত কাজে হাত দেয় কিনা। না দিলে পঞ্চায়েত ডাকবে সে আবার। ক্ষেত পড়ে থাকলে, রোপাই না হলে পেট ভরবে কি করে দলের? নতুন জমি, এমনিতেই ফসল হবে কম। ভুখা মরতে তো পারবে না লাপ্‌রার মুণ্ডারা। ধানের ফলন বেশি না হলে ভাগবাঁটরা করে নিতে হবে। জমি চাষ করাই কাজ সকলের; ধান তো কারও নিজের নয়।

গাসি আসলে খোঁজ রাখে নি। কিংবা পানা মান্‌কিই গোপন রেখেছিলো। লোহারের ঘরে সারা দিনরাত কি ঠুকঠাক হচ্ছিলো তা তো জানতো না কেউ। জানতো না লোহারী পাথর গালিয়ে পানা মান্‌কির নাহাল তৈরী হচ্ছে তার ঘরে।

হঠাৎ একদিন সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলো। দেখলো, পানা মান্‌কি ক্ষেতে নাহাল দিচ্ছে। ভয়ে শিউরে উঠলো সকলে। পাপ হবে, নিশ্চয় পাপ হবে তাদের।

পানা মান্‌কির কিন্তু ভয় নেই। মান্‌কিকে তো আর বিটলা হতে হবে না। তাকে এক ঘরে করবে কার সাহস আছে? একটাই বলদ পানার, আরেক দিকে তার ছেলের বৌকে জুতে দিয়ে ক্ষেতে লাঙল চালাচ্ছে পানা। সকলে অবাক চোখ মেলে দেখলে।

বৌ আর বলদ, দুই তো হকের ধন। বৌকে লাঙলে জুতে দিয়ে এমন কিছু অন্যায় করে নি পানা। গরুর গাড়িতে একটা বলদ মরে গেলে আরেকটা দিকে কাঁধ দেয় জোয়ানগুলো। আর বুড়োরা জুতে দেয় কম বয়েসী মেয়ে নয় তো বৌকে।

কিন্তু মাটি হলো মা। তার শরীরে লাঙল দিচ্ছে পানা? জাত ধরম কি নেই নাকি?

গাসির ভক্তরা রেগে টাঙি উঁচিয়ে ধরলে।

বললে, হুকুম দে তুই বুড়াঠাকুর, পাপী মান্‌কিটারে খতম করে দিব।

গাসি হাসলো। বললে, ক্ষ্যাপে গাছিস তুরা। বোঙারা কি ঘুমায় আছে? উয়ার ঘর জ্বালায় দেবে না বোঙারা!

—তখুন পঞ্চায়েত ডাকে দে।

উঁহু। পঞ্চায়েত ডাকবে না গাসি। ও শুধু অপেক্ষা করবে। অপেক্ষা করে দেখবে, কখন নিজের পাপে নিজেই জ্বলে মরবে শয়তানটা।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অপেক্ষা করলো গাসি।

কিন্তু কোনো অভিশাপই নেমে এলো না পানা মান্‌কির ওপর। বরং সকলে দেখলে, পানার ক্ষেতি জমিটাই ভরে উঠেছে সোনালী ঢেউয়ে। ধানের শিষে যেন ঢেউ বয়ে যায় তার ক্ষেতের ওপর দিয়ে।

গাসি দেখলো, দেখে জ্বলে উঠলো রাগে। আর জোয়ানরা কানাঘুষো করলো নিজেদের মধ্যে।

বললে, মান্‌কি বটে পানা, পাঁচ মুণ্ডার মান্‌কি। বুদ্ধি গাসির থিকা কম নয়।

বুড়োবুড়িরা বললে, ধরম অধরমের বিচারটা মান্‌কিই দেয় বটে, উয়ার কাজটা পাপ হবে ক্যানে।

সুতরাং একে একে সকলেই ক্ষেতে লাঙল দেবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠলো। ফলনটা বেশি হবে বটে, ভুখা মরতে হবে না। জোয়ানগুলো বললে, পঞ্চায়েতে পানার কথাটাই শুনবার লাগবে, বুদ্ধির কথাটো পানাই কইছে। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও কেউ সাহস পেল না জমিতে লাঙল দেয়ার।

ধীরে ধীরে, মাসের পর মাস ক্রমশ প্রতিপত্তি বাড়তে শুরু করলো পানা মান্‌কির। সকলে বলতে শুরু করলো, মালগুজারি দেওয়াটা পাপ নয়। গাসি মুণ্ডার কথা শুনে সিল্লির ক্ষেতিজমি ছেড়ে না এলেই ভালো হতো।

গাসি মুণ্ডার বিরুদ্ধে পানা মানকির সুপ্ত আক্রোশ ক্রমশই বেড়ে চললো। বেড়ে চললো পানা মান্‌কির ভক্তের সংখ্যা। একজন কি দু'জনের দোষ যেখানে, পঞ্চায়েৎ শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু ধীরে ধীরে সারা লাপ্‌রাই যেখানে জমিতে লাঙল দেবার জন্যে উদগ্রীব সেখানে বিটলা করতে গেলেই তো গাসি নিজেই একঘরে হয়ে যাবে।

ক্রমে ক্রমে সারা পত্তনই পানা মান্‌কির মতো লাঙল চালাতে চাইলে। পাহাড়ী ঢালুর অনুর্বর ক্ষেতেও ধানের শিষ দুলে দুলে উঠলো পানার ক্ষেতে। ধান পাকলো, গোলা ভরে উঠলো মান্‌কির।

পৌষ পরবের উৎসব ঘনিয়ে এলো। তোড়জোড় শুরু হলো প্রতিটি ঘরে। চাল গুঁড়িয়ে রাখতে ব্যস্ত মেয়েরা। আর মাণ্ডি মদ চোলাই করে হাঁড়ি ভরিয়ে রাখতে।

চাঁপা রঙের পাকা মহুয়া ঝরে পড়ছে চতুর্দিকে। মহুয়ার মিষ্টি গন্ধ বাতাসে। মৌমাছি ভিড় করে আসে সে গন্ধে। আর মেয়েরা ভিড় করে আসে টুকরি হাতে। পাকা মহুয়া কুড়োতো কুড়োতে দু-দশটা মুখে ফেলে দেয় নিজেরা। বাচ্চাগুলোকে খাওয়ায়। পাথুরে জমিতে কতোটুকু আর ধান জন্মায়। সে ধানে কি সারা বছর চলে? ভুট্টার আবাদ করতে হয় তাই। আর বুনো মহুয়ার মদ চোলাই করে রাখতে হয়। তারা জানে, শরীর তৈরি হয় নেশায়। 'মাণ্ডি'—মদ নয়, মুণ্ডাদের পেটের অন্ন।

তাই ছোটোবেলা থেকেই বাচ্চাগুলোকেও নেশায় অভ্যস্ত করে তোলে।

মহুয়া কুড়োতে কুড়োতেই কুমারী মেয়েদের মধ্যে হাসি ঠাট্টা চলে। মন জানাজানির চেষ্টা হয়।

পৌষ পরবেই এক দল মেয়ের ঠিগিয়া হবে, বিয়ের কথাবার্তা স্থির হবে। আর যদিও বাপ মা মত না দিলে বাপলা হবে না, তবু নিজের নিজের মানুষ চিনে নেবার, চেয়ে নেবার অধিকার একমাত্র মেয়েদেরই। তাদের ইচ্ছাটাই প্রধান। ধর্মের কিংবা আচারের নিষেধ না থাকলে মেয়ে যাকে পছন্দ করবে তার সঙ্গেই বিয়ে হবে। বাপ মা আগে বলবে না, তুই ঐ সাঙাটারে বিয়া কর।

কিন্তু রাঙিনা ?

রাঙিনার পরম বন্ধু সোমরী। তার শরীরও যৌবনে ভরে উঠছে, তার চোখেও স্বপ্ন দেখা দিয়েছে।

হাতের টুকরিতে মহুয়া কুড়িয়ে রাখতে রাখতে সোমরী বললে, তুয়ার মনটা কি ঠিগিয়ার কথা ভাবছে রাঙনা ?

রাঙিনা লজ্জার হাসি হাসলো। একমনে মহুয়া কুড়োতে কুড়োতে একবার আড় চোখে এপাশ ওপাশ দেখে নিলো সে। তারপর বললে, তুয়ার ?

—বাপ্‌লা করবো নাই আমি।

—ক্যানে ?

সোমরী হেসে বললে, গোহিন্দ গোসাঁইরে খেয়াল আছে তুয়ার, সিল্লির গোহিন্দ ?

—হুঁ।

—আমি উয়ার আখড়ায় পালায় যাবো।

—ক্যানে ? হাসলো রাঙিনা।

সোমরী মুচকি হেসে বললে, গোহিন্দের আখড়ায় কাম করতে লাগে না। শুধু গান আর পরব ! আমরা খাটবো ক্যানে, সাঙারা খাটবে। গোহিন্দের বৌটা বসে থাকে, কাম করে না।

একটু চুপ করে থেকে সোমরী বলে, তুয়ার কথাটা বল, বাপলার কথাটা।

রাঙিনা মৃদু হেসে বলে, আকুমরে কি ফেলায় দিব নাকি!

—আকুম? চমকে ওঠে সোমরী। বলে, ঠাকুরের মতটা মিলবেক নাই, দেখিস ক্যানে।

রাঙিনা হেসে বলে, মিলিবেক নাই তো লাপরা ছেড়ে পালায় যাবো।

—কুথায় যাবি?

—উ জঙ্গলের পানে।

অবিশ্বাসে ঘাড় নাড়ে সোমরী। অবিশ্বাসে হাসে। পালিয়ে যাবো বললেই কি পালানো যায়। তা হলে আর পঞ্চায়েতের ভয় পেতো না কেউ, বিটলার ভয় পেতো না।

ক্ষেত জমি পেয়েও পীড়ের মধ্যে থেকেও যাদের পেট ভরে না, কোথায় পালাবে তারা?

সত্যিই তাই। পালাবার পথ নেই। পালিয়ে পীরিত করা যায়, পেট ভরানো যায় না। গ্রামের বাইরে শুধুই বন আর বন। দুটি মানুষ পালিয়ে গিয়ে কি বন পুড়িয়ে নতুন ক্ষেত বানাতে পারবে? ছাউনী বানাতে পারবে? নাহাল বানিয়ে দেবে কে? বলদ পাবে কোথায়? দল ছেড়ে গেলে কি শিকার জুটবে রোজ?

বন পার হয়ে অন্য কোনো গ্রামে গিয়ে পৌঁছলেও বিপদ কম নয়। জবাবদিহি দিতে হবে তাদের কাছে। ঠিকানা দিতে হবে। তারপর সে গ্রামের পঞ্চায়েত লোক পাঠাবে এই লাপরায়। খবর নিয়ে যাবে আকুম কে, রাঙিনা কে। তারপর সে লোক ফিরে গিয়ে যদি জানায় খবরটা তা হলে সেখানেও বিটলা হবে।

বিটলার নাম শুনলেই তাই শিউরে ওঠে সকলে।

বন পার হয়ে কোন দিকে গ্রাম আছে, কাদের গ্রাম সে সব কোনো খবরই জানে না কেউ। তাই নিজেদের গ্রাম ছাড়া আর

যে কোথাও কিছু আছে খবর রাখে না তারা। জানতেও পারে না। শুধু জানে সিল্লির সেই ফেলে আসা পট্টি। কিন্তু সেখানেও মালগুজারির ভয়।

এতোসব কথা ভেবেছে বলেই অবিশ্বাসের হাসি হাসলো সোমরী। বললে, পালায় যাবি তো চিতায় খায়ে দিবে।

কথাটা কানে যেতেই পিছন ফিরে তাকিয়ে রাঙিনা হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো, চিতা! চিতা!

চিৎকার শুনেই সব মেয়েগুলো টুকরি ফেলে কুড়োনো মহুয়া ফেলে দিয়ে ছুটে পালাতে শুরু করলো।

তা দেখে খিলখিল করে হেসে উঠলো রাঙিনা।

তার হাসি দেখে রসিকতাটা বুঝতে পেরে সকলে চটে গেল, তারপর তারাও হেসে উঠলো।

রাঙিনা হেসে বললে, ডরাস ক্যানে, চিতা কি খায়ে লিবে?

—না লিবে না। অনুযোগ করলে একটা বাচ্চা মেয়ে। ব্যঙ্গ করে বললে, টাঙি নাই, আপাড়ি নাই, ডবাস ক্যানে!

রাঙিনা হেসে বললে, চিতা মারতে কি ধনুক লাগে রে, উ-তো হাতে মারবার জিনিস বটে।

সত্যিই তো। চিতাবাঘ কি তীর-ধনুকে শিকার করতে হয়? দু-হাতের শক্তিই তো যথেষ্ট।

রাঙিনাব কথা শুনে হেসে ওঠে মেয়েগুলো। ভয় উবে যায় মন থেকে। দু-হাত তুলে হাসতে হাসতে গান জুড়ে দেয় তারা।

এমনি ভাবেই দু-হাত তুলে গান গাইতে গাইতে পাহাড়ের ওপারে, কখনো ঘন গভীর জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে যায় তারা। হাতে না টাঙি, না ধনুক। খালি হাতেই চলে যায় দল বেঁধে। জ্বালানী কাঠ কিংবা গরু-ছাগলের জন্যে বট অশথের পাতা ভেঙে মাথায় বোঝা নিয়ে তরতর করে নেমে আসে পাহাড়ী পথ বেয়ে।

কারও পিঠে বাঁধা থাকে পাঁচ মাসের বাচ্চা, কারও বা তিন

বছরের মেয়ে সমান তালে ছুটতে ছুটতে নামে তার মায়ের হাত ধরে।

জঙ্গলের মানুষ তারা, জঙ্গলের জীবজন্তুকে ভয় পাবে কেন!

সেদিনও এমনি দল বেঁধে মহুয়া কুড়োতে কুড়োতে পাহাড়ের ওপারে ঘন বনের ভেতরে ঢুকে পড়েছিলো সকলে। মহুয়ার গন্ধে ভরে গেছে চতুর্দিক। সবুজ ঘাসের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে অজস্র চাঁপা রঙের পাকা মহুয়া।

এক মনে কুড়োতে কুড়োতে কখন যে আলো নিভে গেছে, অন্ধকার নেমে এসেছে কেউই টের পায় নি। আবছা অন্ধকারটা আরো গভীর হতেই চমকে উঠলো রাঙিনা।

বললে, এই মেয়েগুলান, ফিরতে লাগবে নাই আজ? রাত-পহর কি মৌয়া কুড়াবি নাকি?

সোমরীও সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তাই তো, বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে।

সেও একটা হাঁক দিয়ে বললে, ঘুম পহর নামলো রে, ঘরকে চল, ঘরকে চল।

ডাক শুনে সকলেরই হুঁশ হলো। তাড়াতাড়ি মহুয়ার ঝুড়ি মাথায় তুলে গাঁয়ের পথ ধরলো তারা।

দ্রুত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো সোমরী।

পিছন থেকে কে একজন ঠাট্টা করলে।—কোন পিয়ারের ডাক শুন্যা দাঁড়ায় গেলি রে সোমরী?

সোমরী তখনও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দূরের অন্ধকারের দিকে।

—কি দেখছিস বটে ফ্যালফালায়ে? কে যেন হেসে ঠাট্টা করলো।

সোমরী ধীরে ধীরে বললে, ডাইন লাগছে।

বলে আঙুল দেখালো দূরের দিকে।

সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকালো সেদিকে। দেখলে আগুন জ্বলছে দূরের অন্ধকারের মধ্যে। কিন্তু আগুন কেন ওখানে? তবে কি ডাইনের মুখের আগুন? না ভূতপ্রেতের নিঃশ্বাস?

বনের আগুন নয়। ঠিক যেন আলোর মতো মনে হলো। ওদিকে আলো আসবে কোত্থেকে? ভয় পেয়ে গেলো ওরা। দ্রুত পায়ে ছুটতে ছুটতে পালালো সব গ্রামের দিকে।

সেই কথা শুনেই সুখন চলে গিয়েছিলো পাহাড় পার হয়ে। দূর থেকে লক্ষ্য করেছে সে। দেখেছে, একদল লোক ছাউনী ফেলেছে ওখানে। আরেকদল এগিয়ে আসছে এদিকেই।

শুনে ভয় পেয়ে গেলো সারা গ্রাম। যে যার নিজের নিজের টাঙি ঠিক আছে কিনা দেখলো, তীর-ধনুক ঠিক আছে কিনা দেখলো। তীরে বিষ লাগাতে শুরু করলো সাঙার দল।

বন্যার সময় সাপ আর মানুষ একই গাছে আশ্রয় নেয়। পানা মান্‌কি আর গাসি মুণ্ডাও তেমনি এসে জড়ো হলো এক জায়গায়। বাইরে থেকে যখন বিপদ আসছে তখন ঘরোয়া ঝগড়া মিটিয়ে ফেলতে হবে।

সুখনকে প্রশ্ন করে করে সব জেনে নিলো সকলে। কেউ বললে, ওঁরাওয়ের দল। কেউ বললে, বীরহর। বনের মানুষ যারা ক্ষেতি জমি না বানিয়ে এখনও সিন্দ্‌রাদের মতো শিকার করে করে ঘুরে বেড়ায় তারাই।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা কেউই বুঝলো না।

দেখতে দেখতে আগন্তুকের দল স্পষ্ট হয়ে উঠলো। পাহাড় আর বনের আড়ালে লুকিয়ে দেখলো গাসি মুণ্ডা, দেখলো পানা মান্‌কি।

না, ওঁরাও নয়, বীরহরও নয়।

লোকগুলোর পোশাকআশাকের দিকে তাকিয়ে গাসি বলে উঠলো, দেকো। দুষমণ বটেক।

পানা মান্‌কি বললে, হুঁ দেকো বটেক।

দেকো অর্থাৎ হিন্দু। সমতলভূমির সভ্যমানুষ মাত্রেই তাদের কাছে দেকো। যারা কোমরে কাপড়ই নয়, গায়েও জামা পরে। যারা লাঙল দিয়ে চাষ করে। যারা মুখের ভাষাকে কাগজে কলমে লিখতে পারে।

না, দুষমণ হ'লেও ভয়ের কিছু নেই। দেকোদের অবশ্য সন্দেহের চোখে দেখতে হয়, বিশ্বাস করতে নেই। তা বলে ভয় পাবারও কিছু নেই। ঝগড়া বিবাদ হ'লেই ওঁরাওদের মতো তীর-ধনুক নিয়ে ছুটে আসে না দেকোরা।

কিন্তু মালগুজারি বাবু নয় তো ? ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলো সকলে। দূর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে যতোটা স্পষ্ট করে দেখা যায়। না, মালগুজারির জন্যে আসেনি। বোধ হয় সিন্দ্‌রা। শিকার করতে এসেছে।

মালগুজারি বাবু এসেছিলো ডুলিপাল্কীতে। তার সামনে-পিছনে ছিল চার চারজন পাইক বরকন্দাজ। সঙ্গে তেমন কিছু জিনিষপত্তর ছিল না তার।

এদের সঙ্গে লটবহর অনেক। ঘোড়ার পিঠে চড়ে এলো দু'জন লোক। সঙ্গে আরো অনেকে। পিছনে একটা খচ্চরের পিঠে জিনিষপত্তর।

সারনা থেকে বেশ খানিকটা দূরে, পাহাড়ী ঝর্ণাটার ধারে এসে নামলো তারা।

দেখতে দেখতে তাঁবু খাটানো হল।

আকুম আর সুখনও দূর থেকে দেখলো, দেখে চোখ কপালে উঠলো তাদের। লাপরার ক'খানি ঘরে ছাউনী দিতে মাসের পর মাস কেটে গিয়েছিল তাদের, অথচ এ লোকগুলো দেখতে না দেখতে ঘর বানিয়ে নিলো। আশ্চর্য্য ব্যাপার তো।

আগন্তুকের দল তখন তাঁবু ফেলে রান্নার দিকে মন দিয়েছে।

এত সব সাজসরঞ্জাম কোনদিন দেখেনি মুণ্ডারা। মাটির হাঁড়ি, মাটির সান্‌কি, আর মেয়েগুলোর গলায় হাতে বনফুলের মালা—এই তো যা কিছু সম্পদ। সম্পত্তি শুধু বৌ আর বলদ। কিংবা আধা কালো আধা লাল কুঁচফলের মালা।

কিন্তু সাজসরঞ্জাম দেখার পরেও আরো কিছু দেখা বাকী ছিল। সাহসে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে তাঁবুর কাছাকাছি এসে পৌঁছলো সুখন। একটা গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলো। উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলো মানুষগুলোর দিকে।

তাদেরই মধ্যে একজন রান্নার ব্যবস্থা করতে শুরু করে দিয়েছে তখন। কাঠে কেরোসিন ঢেলে ফস্ করে একটা দেশলাই জ্বালিয়ে ধরতেই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো।

তা দেখে ভয়ে চমকে উঠলো সুখন। ছুটতে ছুটতে ফিরে এসে খবর দিলো সকলকে। সবাই জড়ো হলো খবর শোনবার জন্যে।

বিস্ময়ে চেয়ে রইলো তারা সুখনের মুখের দিকে। সকলেই যেন সুখনের প্রত্যেকটি কথা হৃদয়ঙ্গম করতে চায়। অবিশ্বাস করবার কথা নয়। সুখন নিজের চোখে দেখে এসেছে।

চকমকি ঠুকে ঠুকে সোলা নয়তো খড়ে আগুন ধরিয়ে ফুঁ দিয়ে দিয়ে উনোন ধরাতে হয় তাদের। অথচ এ লোকগুলো যেন মন্ত্র জানে। একটা ছোট্ট বাক্স থেকে সরু একটা কাঠি নিয়ে ঘষে দিতেই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠতে দেখেছে সুখন।

এমন আজব জিনিষ গাসি মুণ্ডার দল এর আগে আর কখনও দেখে নি।

নতুন যারা এলো তারা রাজার জমির খাজনা নিতেও আসে নি, বনের পাখি শিকার করতেও আসে নি।

প্রথম দলটা এসে তাঁবু ফেলার পর আরো একদল এলো। ওয়াটসন, নির্মল সাহানা, বাবু ব্যানার্জি ; আর তাদের সাঙ্গপাঙ্গ। মিশিরজী আর কাসেম এলো যন্ত্রপাতি নিয়ে। সঙ্গে একদল কুলি মজুর। কেউ সাঁওতাল, কেউ ওঁরাও, বেশির ভাগই বিলাসপুরীয়া।

একটা ছোট্ট টিলার গায়ে গাছের ছায়ায় তাঁবু পড়লো ওয়াটসনের। তারই চারপাশে সাহানা, ব্যানার্জি, মিশিরজী আর কাসেম। মেয়েপুরুষগুলো লেগে গেল ঝোপঝাড় পরিষ্কার করতে। বেশখানিকটা গণ্ডী টেনে চারপাশে এসিড আর পাউডার ছড়ালে তারা। সাপখোপ না আসে। কাঁকড়াবিছের কামড় না খেতে হয়।

পরের দিনই ভোর থেকে যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে পড়লো সকলে। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফিরতে চায় ওয়াটসন।

সাহানা সায় দিয়ে বললে, আমাদের কুলিগুলো বলছে ওদিকে একটা গাঁ দেখেছে মুণ্ডাদের। কিন্তু লোকগুলো নাকি ওদের কাছ ঘেঁষতে চাইছে না।

ব্যানার্জি হেসে বললে, তীরটীর না ছুঁড়ে দেয় রেগে গিয়ে।

বন্দুকের মাজ্‌লটা পরিষ্কার করতে করতে ওয়াটসন বললে, ঠিক্ কথা। জীবজন্তুকে তো ভয় নেই, ভয় মানুষকে।

মুখে নানা রকম ভয় ভরসার কথা বললে কি হবে, মনে মনে সব যেন দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছে।

দিগ্বিজয় না হোক্, পাতালবিজয়।

বোরিং এক্সক্যাভেশনে বেরিয়েছে ওরা। মাটির তলায় কোথায় কতখানি কয়লা লুকিয়ে আছে তার হদিস জানতে।

এ তল্লাটে কয়লা যে আছে তা নিঃসন্দেহ। বিশ পঁচিশ ক্রোশের মধ্যে অনেকগুলো নতুন খনি আবিষ্কার হয়েছে। কাজ চলছে সে-সব কোয়ারীতে। কয়লা এদিকেও আছে, পরীক্ষা করে শুধু দেখতে হবে কতখানি আছে। এক্সপ্লয়েটেশনের যোগ্য কিনা। দরে পোষাবে কিনা।

ন্যাশনাল ওয়েল্থ নষ্ট হচ্ছে বলে চিৎকার করছে বটে দু'একজন দিশী এজিটেটর, কিন্তু ডি ডি সিণ্ডিকেটের করনডির তিন নম্বর খাদটা জলে ডুবিয়ে না দিয়ে উপায় ছিল না। যে-পরিমাণ ওভার-বার্ডেন সরিয়ে নতুন যন্ত্রপাতি আনিয়ে বাকী বিশ হাজার টন কয়লা উঠতো ওই খাদটা থেকে, খরচের তুলনায় তা অনেক কম। কয়লা যখন শেষ হয়ে যাবে দেশ থেকে, তখন ভাবা যাবে ন্যাশনাল ওয়েলথের কথা। অভাব ঘটলেই দাম বাড়বে চড়চড় করে, তখন পোষাবে ওদিকে মন দেয়া। এখন নতুন কোলিয়ারী সুরু করায় মার্জিন অফ প্রফিট অনেক বেশি।

তাই ডি ডি সিণ্ডিকেটের হয়ে বোরিং এক্সক্যাভেশনে এসেছে ওরা। একশো ফুট অন্তর পাইপ চালিয়ে দেখতে হবে কত ফীট নীচে কয়লার সীম, ব্লাফ না রেগুলার। মিনিমম কত রেজিং হবে নামমাত্র খরচে।

যন্ত্রপাতি লোকলস্কর নিয়ে ওয়াটসন বেরিয়ে পড়লো কাজে। লাপরার মুণ্ডাদল লুকিয়ে লুকিয়ে দেখলো দূর থেকে। না ভয় ডরের কিছু নেই। টাঙি কুড়ুল নামিয়ে রাখলো তারা। ওরা এসেছে নিজেদের কাজে।

কিন্তু কি কাজ?

এ ওর মুখচাওয়াচাওয়ি করলো। সত্যিই তো, কি কাজ। তা কেউ বুঝে উঠতে পারে নি। দেখেছে শুধু, গায়ে জামা-পরা

লোকগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে তাঁদেরই মত দেখতে খালি-গায়ের লোকগুলো, কথাবার্ত্তাও মনে হয়েছে যেন এক। তবু, সাহস করে এগিয়ে যেতে পারেনি কেউ, প্রশ্ন করে জেনে নিতে পারেনি ব্যাপারটা কি।

শুধু দেখেছে, কি একটা যন্ত্র দিয়ে হাপাং হাপাং করছে লোক-গুলো, আর একটার পর একটা নল ঢুকছে মাটির ভেতর।

কে একটা মেয়ে বিজ্ঞের মত বললে, কুমরু ডাকাতের দল ওটা, লুঠের মাল লুকিয়ে রাখছে মাটিতে।

মাসখানেক পরে তাঁবু তুলে নিয়ে মালপত্র বোঝাই করে চলে গেল ওয়াটসনের দল। যেমন এসেছিল তেমনি। আসতে দেখে যতখানি বিস্মিত হয়েছিল তারা, চলে যেতে দেখেও ততখানি বিস্মিত হ'ল।

মাস ছয়েক কাটলো চুপচাপ। তারপর হঠাৎ একদিন দেখলে মারাংগাড়ার ওপারে এসে জমা হয়েছে একরাশ মুণ্ডা ওঁরাও সাঁওতাল।

সঙ্গে বাবু ব্যানার্জি।

পনেরো মাইল দূরের স্টেশন থেকে সিধে একটা রাস্তা তৈরী হ'ল পাহাড়ের গা বেয়ে, বনের ভেতর দিয়ে। কংক্রিটের পুল তৈরী হ'ল মারাংগাড়ার ওপর।

তারপর আরো কুলিমজুর এলো, আরো সাহেব সুবো। দূরের স্টেশন থেকে যে রাস্তাটা, তার ধারে ধারে পোষ্ট পুঁতে পুঁতে একটা রোপওয়ে তৈরী হ'ল। দুটো সমান্তরাল মোটা তারে পঁচিশ গজ অন্তর বাকেট ঝুলতে ঝুলতে আসে, ঝুলতে ঝুলতে যায়। কখনও মোটরে, কখনও রোপওয়ে মারফৎ যন্ত্রপাতি এলো। সিণ্ডিকেটের নিজস্ব ডাইনামো শব্দ করে জেগে উঠলো।

মাটিকাটারী কুলিদের শাবল আর গাঁইতির আওয়াজে মুখর হয়ে উঠলো লাপরার শান্ত বাতাস।

ধীরে ধীরে নতুন করে জেগে উঠলো লাপরার কোলিয়ারী।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের একদল আদিম মানুষের রূপলুব্ধ চোখের সামনে জ্বলে উঠলো বিংশ শতাব্দীর যন্ত্র সভ্যতার বধূ-বিলাসিনীর রূপ। বিস্ময়ে, আতঙ্কে, অবিশ্বাসে চেয়ে রইলো তারা। কাছে এগিয়ে আসার লোভ, আর আশঙ্কায় দূরে সরে যাবার ইচ্ছা—এই দ্বিমুখী দ্বন্দ্বের মাঝখানে পড়ে রইলো তারা।

শুধু সুখন একদিন সাহসে ভর করে এগিয়ে এলো একটা সাঁওতাল কুলির কাছে! দেশলাই জ্বালিয়ে কুলিটা বিড়ি ধরাতেই সুখন এসে দাঁড়ালো তার পাশে।

আঙুল বাড়িয়ে দেশলাইটা দেখালে। বললে, ইটা কি বটে?

কুলিটা হাসলো।—শালাই বটে।

হাত বাড়িয়ে দেশলাইটা চাইলো সুখন।

দিলো লোকটা।

দেশলাইটা হাতে পেয়ে আনন্দে সারা মুখ ভরে উঠলো সুখনের! একটার পর একটা কাঠি বের করে আর ঘষে ঘষে সেটা জ্বালায়। আগুন জ্বলে উঠতেই খলখল করে হেসে ওঠে।

কিন্তু পর পর অনেকগুলো কাঠি জ্বালাতে দেখে চটে গেল লোকটা, দেশলাইটা কেড়ে নিয়ে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিলো সুখনকে।

বললে, একটো পয়সা দাম লাগছে শালাইটোর।

পয়সা? একটা পয়সা দাম লেগেছে দেশলাইটার। কথাটা শুনলো সুখন। শুনে গালে হাত বোলাতে বোলাতে সরে এলো।

পয়সা কাকে বলে, কি দাম ঐ তামার চাকতিটার, তা কি ছাই সুখন জানে? সুখন কেন, লাপরার আরণ্যক মুণ্ডাদলের কেউই জানে না। এতদিন এই উপজাতি অঞ্চলগুলি যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ছিল সমগ্র পৃথিবী থেকে। মাত্র কয়েক ক্রোশ দূরে দূরেও যখন সভ্য জগতের হাওয়া এসে পৌঁছেছে, যন্ত্রের সাহায্যে শহর

গড়ছে, পাহাড় ভাঙছে, পাতাল খুঁড়ছে, তখনও এই লাপরা আর লাপরার মতই শত শত অরণ্যপল্লী নিজেদের বাঁচিয়ে চলেছিল যন্ত্রের বিষনিঃশ্বাস থেকে। ওরা অন্ততঃ তাই ভেবেছে, যন্ত্র-সভ্যতাকে ভেবেছে বিষাক্ত সভ্যতা।

মুণ্ডার দল এসবের পরোয়া করেনি। তাদের মধ্যে একদল ভেবেছে খাদে নামা পাপ, মাটি খুঁড়ে খাদ তৈরী করা পাপ, ওঁড়াও সাঁওতাল গোন্দদের সঙ্গে এক ধাওড়ায় বাস করা পাপ। আরেকদলের চোখে লোভের ইশারা জেগেছে। তামার একটা পয়সাই পৃথিবী শাসন করছে, দেখতে পেয়েছে তারা। তাই পঞ্চায়েতের শাসনকে উপেক্ষা করে, মানকি আর মুণ্ডার শাসনকে উপেক্ষা করে খাদে কাজ নেবার জন্যে ছুটে এসেছে। চিরকালের বিশ্বাসকে বিসর্জন দিয়ে নতুন বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে শান্তি খুঁজেছে।

লাপরার মুণ্ডাপল্লীব লোকগুলোও তাই অস্বস্তি বোধ করলো আড়কাঠির ডুগডুগি শুনে।

তাদের চোখের সামনে গড়ে উঠলো রোপ-ওয়ে, নতুন তৈরী রাস্তা দিয়ে এঁকে বেঁকে লরীর পর লরী এলো, ডাইনামো বসলো, আলো জ্বললো, বাংলো তৈরী হ'ল, ধাওড়া বানানো হ'ল কুলি-কামিনদের জন্যে। আর বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলো তারা। কোলিয়ারীর অঞ্চলটুকুকে ঘিরে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো মুণ্ডাপল্লীর অনেকে। ওখানে যেন অনেক আনন্দ, অনেক শান্তি। দুঃখ নেই, দুর্দ্দশা নেই। মালগুজারির ভয়ে তটস্থ হ'তে হয় না, বৃষ্টির আশায় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না। কলের তৈরী কাপড় পরে মেয়েগুলো, হাতে রঙিন কাচের জলচুড়ি, কানে গলায় রুপোর গহনা। আর পুরুষগুলো মদে চুর হয়ে থাকে। ওখানেও তাদের মতই মাদল বাজে সারারাত, নাচে আর গায় মেয়ে-পুরুষ মিলে।

মাঝে মাঝে দূর থেকে দেখে আসতো সকলে। ক্রমশঃ সাহস বাড়লো। দু'একজন দু'একজন করে কুলিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে শুরু করলো।

এমন সময় সিণ্ডিকেটের হুকুম এলো, লোক চাই। আরও কুলি চাই খাদের জন্যে।

ধাওড়ার সর্দ্দাররা শুনলো, এক একটা কুলি জোগাড় করে দিলে পাঁচ টাকা করে দেবে সিণ্ডিকেট। শুনেই মুণ্ডাপল্লীব দিকে ছুটলো বুধন সর্দ্দার।

বুধন সর্দ্দারের ডুগডুগি শুনে ছুটে এলো লাপরার মুণ্ডারা।

বুড়ো বটের নীচে সারনা-তলায় এসে জমায়েৎ হলো বুড়ো আব জোয়ানের দল। মেয়েগুলোও গায়ে গা দিয়ে সারি দিয়ে দাঁড়ালো উৎসুক বড়ো বড়ো চোখ মেলে। ঠিক যেমন বিস্ময়ে চোখ মেলে সিণ্ডিকেটের বাবুদের আসতে দেখছে তারা, যে-চোখ বিস্ফারিত হয়েছে বনভেদী রোপওয়েব দুটো মোটা তারের লাইনে মাথার ওপর দিয়ে সারি সারি বাকেট ঝুলতে ঝুলতে আসছে আর ফিরে যাচ্ছে দেখে। যতই নতুন মানুষগুলোর শক্তির পরিচয় পেয়েছে তারা ততই বিস্মিত হয়েছে। যত না বিস্মিত হয়েছে তার চেয়ে বেশি ভয় পেয়েছে। তাদের ছোট ছোট চাকার ক্ষুদে গরুর গাড়ীর সঙ্গে বড়ো বড়ো লরীর গতিবেগ তুলনা করে স্তম্ভিত হয়েছে। স্তম্ভিত হয়েছে ডিনামাইটের আওয়াজে, ডিনামাইটের শক্তি দেখে। বড়ো বড়ো পাথরের সীম ভেঙে টুকরো টুকরো হতে দেখেছে, দেখেছে পাহাড় ফাটিয়ে যাতায়াতের পথ তৈরী করতে।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি তাজ্জব ব্যাপার এই তামার চাকতি। পয়সা।

কোলিয়ারীর এক পাশে একটা হাট বসে প্রতি রবিবারে। এতোয়ারীর হাট। চাল গম কলাই মটর থেকে কাপড় আর রুপোর

গহণা সব কিছুই পাওয়া যায় সেখানে। পাওয়া যায় এই পয়সার বিনিময়ে।

মেয়েদের জটলায় রসিয়ে রসিয়ে সে-গল্প বলেছে সুখন। বলেছে দামড়িটা থাকে তো সকল জিনিসই দিবে দুকানীরা।

—সে ত দিবেই। ফোড়ং কেটেছে কে একজন। হেলে দুলে হেসে এগিয়ে এসে বলেছে, কিন্তুক দামড়িটা কে দিবে?

—ক্যানে, খাদানবাবুরা দিবে।

শুনে চোখ গোল গোল করে সুখনের দিকে তাকিয়েছিল মেয়েগুলো। ঠিক যেন বিশ্বাস হয় নি। দামড়ির যদি এতই দাম যে তা দিয়ে দোকান থেকে যা খুশি কেনা যায়, তা হলে সে জিনিস দেবে কেন বাবুরা।

সুখন বোঝাতে চেষ্টা করেছে, কাজ করলেই নাকি দামড়ি পাওয়া যায়। কিন্তু আর সকলের কাছে তা দুর্বোধ্য মনে হয়েছে। কেন, কাজ তো তারা এমনিতেও করে, তা হলে বোঙারা দেয় না কেন। আর বোঙারা যা দিতে পারে না বাবুরা তা দেবে কি করে? বাবুরা কি বোঙাদের চেয়েও বড়ো নাকি!

এত শত বুঝতে পারে নি ব'লেই সকলে ছুটে এলো সারনা তলায়, বুধন সর্দ্দারের ডুগডুগি শুনে। লোকটা কি বলে দেখাই যাক্ না।

বুধন সর্দ্দার যা বললো, শুনে মনে হ'ল যেন বীরসা ভগবান আবার একবার নেমে এসেছে তাদের মধ্যে। মানুষ নয়, যেন রাজা মানুষ এই বুধন সর্দ্দার। ক্ষেতি জমিতে যেমন দিনভর কাজ করে তারা, তেমনি খাদানে গিয়ে কাজ করতে হবে। কাজ আর কি, মাটি কাটতে হবে। মাটি বয়ে নিয়ে ফেলে আসতে হবে এক ধারে। তার জন্যে মাথা পিছু দেড় পোয়া চাল পাবে রোজ। আর পাঁচ আনা পয়সা।

পাঁচ আনায় বিশটা দামড়ি। বিশটা তামার পয়সা।

তাছাড়া ধাওড়ায় থাকবার ঘর পাবে। মেয়েরা চুড়ি পাবে, কাপড় পাবে, চুট্কি পাবে রুপোর।

বুধন সর্দ্দার সকলের মনে স্বপ্ন বুনে দিয়ে চলে গেল।

আর বুধন চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জটলা পাকাতে শুরু করলো মেয়ে পুরুষ সবাই।

পরবের উৎসাহ নেই, উৎসাহ শুধু খাদান সম্পর্কে। তা দেখে চটে গেলে গাসি। বুড়ো গাসিও শুনেছে বুধনের কথা, শুনে ভেবেছে অনেক কিছু। শেষ পর্যন্ত হেসে উড়িয়ে দিয়েছে সব।

না, খাদানে কাজ করা পাপ। খাদানে ওরাও আছে, জুয়াং আছে, সাঁওতাল আছে। তা ছাড়া খাদানের বাবুরা সব দেকো নয়তো তুড়ুক। তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করা পাপ। দোকানে জিনিস কেনা পাপ।

পাঁঞ্চায়েৎ ডেকে হুকুম দিলো গাসি।—খাদানে কাজ করতে যাবি নাই তুরা। চাঁদু বোঙা ক্ষেতিজমি দেছেন, সেরমা চাঁদো গাড়ার জল দেছেন, দামড়িতে কাম নাই।

পানা মানকি এক কোণে বসে চুপচাপ কল্কেতে টান দিচ্ছিলো। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে খুক খুক করে কেশে এগিয়ে এসে উবু হয়ে বসলো সে।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, পট্টির জোয়ান কি কুড়ি খাদানে কাম লিলে বিধানটা কি হবেক?

—বিধানটা? ক্রুদ্ধ চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে গাসি বললে, টাঙিতে তার মাথাটা কোঁপাই দিব, হুঁ।

হেসে উঠলো পানা মান্‌কি! প্রশ্ন করলে, বিধানটা থির হ'ল তবে? বদল হবেক নাই?

—না, বদল হবেক নাই। ব'লেই দ্রুত পায়ে পঞ্চায়েৎ ছেড়ে চলে গেল গাসি।

পানা মান্‌কি হাসলো নিজের মনেই।

লোকগুলোর মুখের ভাব লক্ষ্য করেছে পান্না। বুঝতে পেরেছে, দু'দিন আগেই হোক দু'দিন পরেই হোক, সকলেই ছুটে যাবে খাদে কাজ পাবার আশায়। চোখে তাদের স্বপ্ন দেখা দিয়েছে, সে-স্বপ্ন ভাঙা যাবে না পঞ্চায়েতের বিধান জানিয়ে।

কিন্তু আর সকলের মত রাঙিনার চোখেও যে এই স্বপ্ন তা গাসি কল্পনা করতে পারে নি।

পঞ্চায়েৎ থেকে ফিরে এসে দেখলে তার ডেরায় বসে তামাক টানছে মেয়েদের ঘুমঘরের নতুন খবর্দ্দারণী।

বুড়ি নান্‌কি মারা যাবার পর এই বিধবাটাকেই খবর্দ্দারণী করেছে পঞ্চায়েৎ।

গাসি ভাবলে, খাদে কাজ করার বিধান নিয়েই বুঝি কিছু বলতে এসেছে বুড়ি। তাই বুড়িটাকে লক্ষ্য করেও কোন কথা বললে না।

বুড়িটা উসখুস করে হঠাৎ বললে, পরবটা ভালো হবেক নাই মন লাগছে।

—ক্যানে ?

—ঠিগিয়া না লাগলে ? পরবটা কি খালি পিঠা খাবার পরব বটে ?

গাসি হেসে বললে, ঠিগিয়া হবে নাই ক্যানে ?

—জুড়ি না লাগলে ঠিগিয়াটা কি হবেক ? এই তুমার মায়েটার কথাই কও ক্যানে !

গাসি হেসে বললে, রাঙিনা ? উ তো দুধেল আছে। মন ভরতি হলে ঠিগিয়া বাছে লিবে।

বুড়ি ধীরে ধীরে বললে, জুড়ি বাঁধেছে রাঙ্‌না, কিন্তুক···

গাসির মুখে হাসি দেখা দিলো, চোখে আগ্রহ। অর্থাৎ, কে সে ছেলেটি ?

বুড়ি অস্বস্তি বোধ করলে, কথা খুঁজে না পেয়ে, হুঁকো টানতে শুরু করলে।

গাসি জিজ্ঞেস করলো, জুড়িটা কার সাথে কয়ে দে ক্যানে।

বুড়ি ইতস্ততঃ করে বললে, কথাটো কয়ে দিলে কাজিয়া হবে বটে।

—কাজিয়া? ক্যানে?

বুড়ি এবার ধীরে ধীরে বললে কথাটা। বললে, রাঙনার মা বুড়িটা, লাপ্‌ড়ি বুড়হি কানে শুনে নাই, চোখ্যে দেখে নাই। ওড়ার নান্‌কি বুড়হিও লজর রাখে নাই রাঙনার পানে। তো দোষটো রাঙনার লয়।

—হুঁ। সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকালো গাসি।—কথাটা কি কয়ে দে ক্যানে।

খবর্দ্দারণী ইতস্ততঃ করে বললে, তুয়ার মায়েটা আকুমের সাথে জুড়ি বাঁধবার চায়।

—আকুম? চমকে উঠলো গাসি। পরমুহূর্ত্তেই হো হো করে সশব্দে হেসে উঠলো। বললে, ক্ষ্যাপে গেলছে, মায়েটা ক্ষ্যাপে গেলছে।

বুড়ি বোঝাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু বুঝতে চাইলো না গাসি। এ হ'তেই পারে না। আকুমের সঙ্গে ঠিগিয়া হবে তার মেয়ের? সাণ্ডিল কিল্লির বাপলা হতে পারে একমাত্র সাণ্ডিল কিল্লির সঙ্গে। সাণ্ডিলদের ভিন্ কিল্লিতে বিয়া সাদী পাপ।

বুড়ি চলে গেল। না, গাসির মত বদলানো যাবে না। গাসি নিজে পঞ্চায়েতের মাথা, সে কি করে এমন বিধান দেবার জন্যে বলবে পঞ্চায়েতকে।

আকুম না, সুখনকে বেছে নিক রাঙিনা। আপত্তি নেই গাসির।

চুপচাপ বসে রইলো গাসি, রাঙিনার অপেক্ষায়। গাড়ায় জল আনতে গেছে রাঙিনা, ফিরে এলে তাকেই সরাসরি বলবে কথাটা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কলসী কাঁখে নিয়ে ফিরে এলো রাঙিনা। তার দিকে চোখ তুলে তাকালো গাসি। এই প্রথম যেন লক্ষ্য করলো

মেয়ে তার ডাগর হয়েছে, বড়ো হয়েছে। ঐ ঠিগিয়ার বয়স হয়েছে ঠিকই। কিন্তু···

না, চেষ্টা করেও কথাটা স্পষ্ট করে বলতে পারলো না।

জল আনতে গিয়ে যুক্তি করেই খবর্দ্দারণীকে পাঠিয়েছিল রাঙিনা। বাপের মতামতটাও শুনে এসেছে। সেও আর কাছে আসতে পারলো না, মুখ তুলে তাকাতে পারলো না।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো গাসি। পঞ্চায়েৎ ডাকতে হবে পরবের জন্যে। পরবের দিন গুণতে হবে খড়ি পেতে।

পরের দিন পঞ্চায়েতে এসে জড়ো হ'ল সকলে। সারনা তলায়। গাসি এদিক ওদিক চেয়ে সবে সারনার পাথরে গিয়ে বসেছে, হঠাৎ দেখলো টাঙি কাঁধে নিয়ে হন্ হন্ করে এগিয়ে আসছে পানা মান্‌কি।

একেবারে গাসির সামনে এসে টাঙিটা ছুঁড়ে দিলো সে গাসির পায়ের কাছে। বললে, যা বেটিটাকে কোঁপাই দিবি যা।

গাসি বিস্মিত চোখ তুলে তাকালো। কেন, হঠাৎ মেয়েকে টাঙি দিয়ে কুপিয়ে মারতে হবে কেন?

পানা হেসে বললে, বেটিটা তুযার খাদানে পালায়ছে।

পট্টির সকলের সন্দেহের চোখ ছিল সুখনের ওপর। সুযোগ পেলেই সে ফুরুৎ করে পালাতো খাদানের দিকে। প্রথম প্রথম দূর থেকে দেখতো লুকিয়ে লুকিয়ে, তারপর ক্রমশঃ সাহস করে ধাওড়ার লোকগুলোর সঙ্গে আলাপও পাতিয়েছিল। যা কিছু দেখতো, এসে গল্প করতো পট্টির মেয়েপুরুষদের কাছে। আর বড়ো বড়ো চোখে বিস্ময় প্রকাশ করে শুনতো সবাই। সকলেই স্বপ্ন দেখতো খাদানে কাজ করার, ধাওড়ায় বাস করার। শুধু মনে সাহস পেতো না। গাসি মুণ্ডা বলেছে, খাদানে কাজ করা পাপ। খাদানে কাজ করলে বোঙারা সুখ কেড়ে নেবে, ছেলেমেয়ে কেড়ে নেবে, আগুন জ্বালিয়ে দেবে লাপরার মাটিতে। তাই মনে লোভ পুষে চোখে স্বপ্ন বুনতো লোকগুলো। আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতো, সুখন পালাবে, পালিয়ে যাবে খাদানে।

কিন্তু হ'লো ঠিক উল্টো। সুখনের মনে লোভ জেগেছিল ঠিকই, কিন্তু তা বলে শুধু লোভে পড়ে পাপ করতে যাবে কেন সে। কোড়াকুড়ি সকলেই আশ্চর্য হ'ল কম নয়। রাঙিনা—গাসি মুণ্ডার মেয়ে রাঙিনা কিনা পালিয়েছে খাদানে? তাও একা নয়, আকুমের সঙ্গে।

লুকিয়ে লুকিয়েই মিলতো দু'জনে, তবু গিতিওড়ার অনেকেই জানতো ব্যাপারটা। জানলেও বাধা দেবার কারণ খুঁজে পায় নি কেউ। পীরিত তো পাপ নয়। ঘুমঘরে একসময় তো ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে থাকতো বাপ্‌লার আগে পর্যন্ত। ঠিগিয়া হবে, বাপ্‌লা হবে, তখন ছেলেমেয়েরা ছাড়া পাবে গিতিওড়ার ঘুমঘর থেকে। কিন্তু কিল্লী না দেখে তো বিয়ে হ'তে পারে না।

আর বিয়ে হ'তে পারে না বলেই পালাচ্ছে। আকুম আর রাঙিনা।

গিয়ে দাঁড়ালো সেই বুধন সর্দ্দারের কাছে।

বললে, কাম দে সর্দ্দার, কুঠী দে।

বুধন সর্দ্দার ভালো করে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখলো দু'জনকে। হ্যাঁ, লাপরার মুণ্ডাপট্টিরই লোক বটে। জোয়ান বয়েস, জোয়ান স্বাস্থ্য। কাজ করতে পারবে খাদানে।

আড়কাঠি বুধন তাদের হাজির করলো মুন্‌শী গোপীচাঁদের কাছে।

কাজে বহাল হয়ে গেল দু'জনেই। ধাওড়ার একখানা ঘর দেখিয়ে দিলো বুধন। বললে, ডর নাই তুয়ার, মান্‌কি মুণ্ডার কানুনটো ইখানে চলবে নাই। ইখানে সাহেবরা আছেন, বাবুরা আছেন, হামলা কবলে উদের বাঁধে ফেলবেক বাবুবা।

শুনে নির্ভয় হ'ল দু'জনেই। মুন্‌শীর কাছে আগাম রোজ নিয়ে নতুন সংসার পাতায় মন দিলো।

কাজ আর কি। মাটিকাটারী দলের সঙ্গে ভোর না হ'তেই খাদের মুখে গিয়ে দাঁড়ানো। গলায় বাঁধা চাকতির নম্বরটা হাজ্‌রি বাবুব কাছে বলে মাটি কাটতে লেগে যায় আকুম, আর মেয়েগুলোর সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে মাথায় মাটির ঝুড়ি বয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে আসে রাঙিনা।

দু'জনের মনেই ফুর্ত্তি। নতুন কাজে কি যেন এক নতুন নেশা আছে। কাজ নয়, যেন ছন্দে বাঁধা নাচ।

যতদূর চোখ যায়, শুধু মাটি আর মাটি। লালমাটির রাশ স্তূপীকৃত হয়ে পাহাড় গড়ে উঠছে একদিকে, আর ক্রমশঃ একটা দীঘি জেগে উঠছে যেন। নানা রঙের মাটির স্তর সিঁড়ির মত নীচে নেমে চলেছে কালোমাটির দিকে। কালামাটির দিকে।

কয়লার নাম দিয়েছে ওরা কালামাটি। এই কালামাটির কি দাম, কেনই বা তা খুঁড়ে বের করা হবে, বুঝতে পারে না ধাওড়ার

কুলিকামিনরা। শুধু জানে, এই মাটি কাটা শেষ হ'লে শুরু হবে পাথর কাটা। তখন মজুরী পাবে বেশি। তারপর ঐ কালো পাথরের নীচে যখন কয়লা কাটতে হ'বে তখন আর মাটিকাটারী থাকবে না তারা। হবে মালকাটারী। মজুরী বাড়বে তখন।

সারাদিন রোদ বৃষ্টি সহ্য করে গাঁইতির পর গাঁইতি চালায় আকুম, ঘাম ঝরে পড়ে সারা শরীরের, আর রোদে-তাতা জ্বলন্ত বালি নয়তো আঁকাবাঁকা শীর্ণ পথ ধরে মাটি পাথর বোঝাই করা ঝুড়ি বয়ে বয়ে ওপরে উঠে আসা আর নেমে যাওয়া কাজ রাঙিনার। শাড়ীটা ঘামে ভিজে লেপটে যায়, মনে হয় যেন বৃষ্টিতে ভিজে এলো।

সমস্ত দিনের খাটুনির পর গাঁইতি শাবল জমা দিয়ে ধাওড়ার পথ ধরে দু'জনে। ক্লান্ত শ্রান্ত শরীর নিয়ে ফিরে আসে; কিন্তু মুখ থেকে হাসি নিভে যায় না। সঙ্গী সাথীরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, হাসাহাসি করে। কখনও বা দলের সঙ্গে কদম মিলিয়ে হাততালি দিয়ে গান গাইতে গাইতে সন্ধ্যার আবছায়ায় পথ হাঁটে, কখনও মেয়ের দল কাঁধে কাঁধ জড়িয়ে একটানা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে চলে।

খাদ থেকে উঠে ধাওড়া যাবার পথে একটা ছোট্ট পাহাড়ী ঝর্ণা। ঝর্ণা নয়, খাদের যেখানে যেখানে জল উঠেছে সেখান থেকে পাম্প করে জল ফেলে দেয়া হয় দূরে। সেটাই ঝর্ণা হয়ে বয়ে যায় আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথে। সেই ঝর্ণায় দল বেঁধে স্নান করে সকলে। খাদে নামার নোংরা কাপড়খানা ছেড়ে পরিষ্কার কাপড় পরে সকলে, তারপর ধাওড়ার পথ ধরে।

ধাওড়ায় ফিরে এসে চাটাইয়ের উপর শুয়ে পড়ে আকুম। রাঙিনা রসুই পাকাতে ব্যস্ত হয়। কোনদিন বা সকালের শুখা ভাত আর মাণ্ডি মদ এনে হাজির করে আকুমের সামনে।

মাণ্ডিতো মদ নয়, মাণ্ডি হ'ল জীবন। মদের হাঁড়িতে চুমুক দেয় আকুম আর রাঙিনা। গল্প করে, স্বপ্ন দেখে।

তারপর একসময় ধাওড়ার সামনে ঢোলকের আওয়াজ হয়।

আকুম আর রাঙিনাও এসে দাঁড়ায়, দলের সঙ্গে হাতে হাত দিয়ে আগুন ঘিরে নাচে, গায়। অনেক রাত পর্যন্ত চলে নাচ আর গান।

যেন ক্লান্তি নেই, বিরাম নেই।

মাঝরাত্রে নাচ গান থেমে আসে। পরিশ্রান্ত শরীর আর চোখে ঘুম নিয়ে ধাওড়ায় ফিরে আসে দু-জনে।

আকুম আর রাঙিনা।

মুণ্ডা, ওঁরাও, সাঁওতাল কুলিকামিনদের জল্পনাকল্পনা ওদের দু-জনকে ঘিরে, হাসি বিদ্রূপের সুমধুর হুল্লোড় ওঠে এই আদিম আরণ্যক দম্পতিকে ঘিরে।

দেখে মনে হয় যেন ওদের মতো সুখী মানুষ নেই।

ঘুম-জড়ানো চোখ না খুলেই আধো-আধো স্বরে কথা বলে রাঙিনা। ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলে, ডর লাগতিছে আমার।

মাথার কাছে হাত বাড়িয়ে টাঙিটা স্পর্শ করে আকুম বলে, ক্যানে, ডরাস ক্যানে? আমি রঁয়ছি বটে তুয়ার কাছ পানে, ডরাস ক্যানে?

রাঙিনা কাছে ঘেঁষে আসে। আকুমের চওড়া বুকের ঘনিষ্ঠ হয়ে। আকুমের একখানা হাত এসে পড়ে তার পিঠের ওপর।

ঘুম-জড়ানো স্বরে রাঙিনা বলে, পঞ্চায়েতের ডর লাগে।

—হঃ! একটা শব্দ করে নির্ভয়ের হাসি হাসে আকুম।

—হাসিস্ ক্যানে। বিট্‌লা করবে নাই তিনারা? খাদানে পালায় অ্যালাম, পাপ হঁয় নাই?

আকুম শুনে হাসে আবার। বুধন সর্দারের কাছে শোনা কথাটাই শুনিয়ে দেয়। বলে, রাজার কানুন আছে খাদানে, পঞ্চায়েতের বিচারটো ইখানে চলবে নাই।

—যতি লম্বর কাড়ে লেয় মুনশি, কাম না দেয়?

—ই খাদানে কাম না থাকে, উন্য খাদানে চলে যাবো। বোঙারা হাত দুটা তো কাড়ে লেয় নাই।

চমকে চোখ খুলে তাকায় রাঙিনা, আকুমের মুখের দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রশ্ন করে, উন্য খাদান আছে বটে? কুথায় আঁছে?

বুধন সর্দারের কাছে শোনা কথাটাই শোনায় আকুম। হ্যাঁ, অনেক খাদান আছে। কুমাণ্ডিতে আছে, আরগাড়ায় আছে। বন পার হয়ে হেঁটে গেলে আরো অনেক খাদ আছে, সেখানে গেলেও কাজ পাবে।

বিস্ময়ের ঘোর কাটে না রাঙিনার। ও জানতো বন পার হয়ে আছে মুণ্ডা বস্তি। সেখানেও পঞ্চায়েত আছে, বিটলার ভয় আছে। কিন্তু খাদান আছে, শহর আছে এই বনেরই মাঝে মাঝে তা জানতো না। জানতো, বন যেখানে শেষ হয়েছে সে হলো দেকোদের দেশ। দেকো অর্থাৎ সমতল ভূমিব মানুষ। দেকো অর্থাৎ হিন্দু। যেমন তুড়ুক হলো মুসলমান।

অন্য খাদ যখন আছে, খনি শহর আছে, তখন ভয় নেই।

মনে মনে স্বপ্ন দেখে দু-জনে, মজুরীর পয়সা জমিয়ে দূরের কোনো খাদে চলে যাবে তারা। তারপর ধাওড়ার কাছে খানিকটা ক্ষেতিজমি বানাবে। নাহাল দিয়ে চাষ করবে পানা মান্‌কির মতো। গোলা ভরে উঠবে ধানে।

এতোয়ারের দিনটা ছুটির দিন। হাট বসে খাদের মুখে। কুলিকামিনরা হপ্তার রোজ পায় শনিচারের বিকেলে, আর সেই পয়সা নিয়ে পুরুষগুলো ছোটে মদের ভাঁটিতে। কেউ বা মোরগ-লড়াইয়ের জুয়া খেলতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়।

মেয়েগুলোর লোভ রঙিন কাপড় আর কাচের জলচুড়ির ওপর।

রাঙিনা আর আকুমও যায়। কিন্তু রোজমজুরীর পয়সা হাতে পায় না তারা। আগাম ধার নেয়া টাকার সুদ গুণতে গুণতে

মজুরী শেষ হয়ে যায়। আবার নতুন করে ধার নিতে হয় মুন্‌শীর কাছে।

তাই ধাওড়ার অন্য বাসিন্দেদের মতোই বন থেকে কাঠ কুড়িয়ে এনে বেড়া দিয়ে কুঠরীর সামনে একটুখানি জমি ঘিরে নিয়েছে ওরা।

ধনিয়ার শাক বুনেছে, জনার লাগিয়েছে। মুর্গী আর শুয়োর পুষেছে। ধনের শাক আর মুর্গীর ডিম বেচে দু-পয়সা উপরি লাভের আশায়। হাটে বিক্রী না হ'লে ফিরে এনে নিজেরাই খেতে পারবে।

রবিবারের সকালে ঘুম থেকে উঠে ধনের শাক কাটতে কাটতে রাঙিনা বড়ো মুর্গীটার ডাক শুনতে পেলো।

ফিরে তাকিয়ে দেখলো পায়ের নখে মাটি খুঁড়ছে মুর্গীটা।

তা হলে নিশ্চয়ই ডিম পাড়বে।

ধনের শাক কাটা বন্ধ হয়ে গেল। মুর্গীটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলো সে। চোরা চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো আকুম আছে কিনা কাছে পিঠে, দেখছে কিনা।

খানিক পরে মুর্গীটা সরে গেলো, আর আনন্দে চকচক করে উঠলো রাঙিনার চোখ। একটা তাজা ডিম পড়ে আছে।

কাছে এসে পাহারা দিলো রাঙিনা। চিলে না ছোঁ মারে। এখনও তাজা আছে ডিমটা, তুলতে গেলে নরম খোলসটা ফেটে যাবে।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ডিমটা হাতের মুঠোয় তুলে নিলো রাঙিনা। খোলসটা শক্ত হয়ে গেছে এতোক্ষণে।

সিমসিমারি বেচে দুটো পয়সা পাবার লোভ যে না হলো তা নয়। তবু অপেক্ষা করলো সে, কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো।

ধীরে ধীরে খুশিতে উছলে উঠলো তার চোখ জোড়া।

মুগ্ধ মধুর এক ফালি হাসি তার মুখের ওপর দিয়ে বিদ্যুতের

মতো খেলে গেলো। দূরে যেখানে একটা লাঠি হাতে নিয়ে আকুম শূয়োরের পালটাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে সেদিকে তাকিয়ে চট্ করে ডিমটা লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে রাখলো একটা এনামেলের থালা ঢাকা দিয়ে।

না, আকুমকে বলা চলবে না।

চট্ করে আবার ক্ষুদে বাগিচায় ফিরে এসে এক মনে ধনে পাতা কাটতে শুরু করলো রাঙিনা। যেন কিছুই হয় নি, কিছুই লুকিয়ে রাখে নি সে।

এতোয়ারীর হাট এতোক্ষণে জেগে উঠেছে হয়তো।

চিৎকার করে আকুমকে ডাকলো রাঙিনা।

চিৎকার করেই সাড়া দিলো আকুম। তারপর শূয়োরগুলোকে তাড়াতে তাড়াতে ঘরে এসে ঢুকিয়ে দিলো।

হাটে যেতে হবে। বেওয়ারিশ চরতে দিলে ফিরে এসে হয়তো দেখবে একটা শূয়োর কমে গেছে।

আকুম ফিরে আসতেই ধনে পাতাগুলো এনে দিলো রাঙিনা, সপ্তাহ-ভর জমানো ডিমগুলো।

আকুম বললে, হাটে যাবি নাই? এতোয়ারীর হাটে কি আমি একেলা যাবো বটে?

রাঙিনা হেসে বললে, পাকাই সেরে যাবো। টিপলা মুখে খুঁজে নিবো।

অর্থাৎ টিপলারের মুখে বসবে আকুম তার সওদা দিয়ে, রান্না শেষ করে যাবে রাঙিনা।

হাট তো শুধু কেনা-বেচার জায়গা নয়। হাট হলো ফুর্তির জায়গা। কত লোক আসবে যাবে। বাবুদের সঙ্গে দেখা হবে, সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে হাসি-মস্করা হবে।

সপ্তাহের একটি আনন্দের দিন এই এতোয়ারীর হাট।

আকুমের বেশ মনে লাগলো না কথাটা। দুজনে একসঙ্গে

হাটে যায় প্রতিবারেই। এবার কেন যেতে চাইছে না রাঙিনা কে জানে।

কি যেন ভাবলো আকুম, তারপর শাক আর ডিমের পুঁটলিটা টাঙির এক প্রান্তে বেঁধে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেলো।

আকুম চলে যেতেই ঘরের কাজ শেষ করে রান্নায় বসলো রাঙিনা। পচাই আর ভাত নয় শুধু। আজ ধনের পাতা দিয়ে ভালো করে রাঁধবে সে লুকিয়ে রাখা ডিমটা। আকুমের হিসেব করে রাখা ডিমের মধ্যে থেকে খাবার জন্যে একটাও নিতে পারে না সে। পয়সার লালচ আকুমের। তাই ইচ্ছা থাকলেও তাকে ভালো করে খাওয়াতে পারে না রাঙিনা।

আকুমের সঙ্গে হাটে গেলে একসঙ্গেই ফিরে আসতো, সন্ধ্যের হাটে দু-মুঠো চিঁড়ে কিনে ক্ষিদে মারতে হতো। ফিরে এসেও রাঁধতে পেতো না ডিমটা।

তাই যত্ন করে রাঁধলো রাঙিনা। রান্না শেষ হতে দুপুর গড়িয়ে পড়লো। এনামেলের থালাটায় দু-জনেরই খাবার বেঁধে নিয়ে হাটের পথ ধরলো।

যখন টিপলারের মুখে গিয়ে পৌঁছালো হাটে তখন ভিড়ে ভিড়। এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজলো সে আকুমকে।

না, যেখানটিতে বসবার কথা সেখানে তো নেই আকুম।

সমস্ত হাট ঘুরে ঘুরে খুঁজলো। না পেয়ে ধাওড়ার একজনকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলে, আকুম কুথায় গেছে, জানিস বটে?

মেয়েটা হাসলো, রসিকতার হাসি। বললে, জোয়ান মরদটারে একেলা ছাড়ে দিছিস, উ দেখবি যা রাণ্ডিগুলারে ভাও করছে।

শুনে রাঙিনাও হাসলো।—উ তুয়ার মরদ লয় রে, ওড়ার চাটাইটো উয়ারে খুশ রাখে।

বলে চলে আসছিলো রাঙিনা, পাশ থেকে একটা লোক হেসে

বললে, উন্য চাটাইয়ের সুখটা দেখ ক্যানে তু, আকুমের থিকা জোয়ান আছি বটে।

ক্রমশঃই যেন অশ্লীল রসিকতার প্রতিযোগিতা চলে। কিন্তু কেউই হারতে রাজী নয়।

হঠাৎ রসিকতা থামিয়ে রাঙিনা জিজ্ঞেস করে, সওদা বেচে দিছে আকুম?

—হুঁ। মেয়েটা উত্তর দেয়। তারপর মৃদু হেসে বলে, মোরগ-লড়াইয়ের উখানে দেখে আয় ক্যানে।

—হুঁ। মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর হয়ে ওঠে রাঙিনার মুখ।

দ্রুত পায়ে মোরগ-লড়াইয়ের মাঠে গিয়ে হাজির হয়।

ভিড়ে ভিড় চতুর্দিক। সারি সারি লোক বসে আছে দু-হাতে মোরগ ধরে।

জুড়ি খুঁজছে, বাজি ধরছে সকলে। বাজি ঠিক হলেই দু-জনে এসে বসছে মাঠের মাঝখানে। মোরগের পায়ে ধারালো ছুরি বেঁধে দিয়ে ছেড়ে দিতেই হৈ-হৈ করে উঠছে লোকগুলো। দুটো মোরগই পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে চোট খাচ্ছে একটা মোরগ।

যে জিতবে চোট খাওয়া মোরগটা সেই পাবে। কিন্তু অন্য লোকগুলো বাজি ধরছে তার উপর।

দেখতে দেখতে রাঙিনারও যেন নেশা ধরে যায়। রক্তের নেশা, টাকার নেশা।

হঠাৎ একপাশে আকুমকে দেখতে পায় রাঙিনা।

ভিড় ঠেলে তার দিকে এগিয়ে যায়।

আকুমের কাছে গিয়ে বলে, ভাত আনেছি।

—চ উদিক পানে।

দু-জনে ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে একটা গাছের তলায় বসে।

ভাত ঢাকা কাপড়ের বাঁধন খুলে দু-জনেই এক থালায় খেতে বসে।

খেতে খেতে হঠাৎ ডিমের স্বাদ পেয়ে চমকে ওঠে আকুম।

—সিমারি বটে? কুথায় মিললো সিমারিটো?

রাঙিনা হেসে বললে সকালের গোপন খবরটুকু। —তুয়ার লেগে লুকায় রাখেছিলাম।

কিন্তু আকুম হাসলো না। রেগে গিয়ে বললে, বাবুদের পানা দরাজ হঁয়েছিস তু। সিমারিটো দু দামড়িতে বিকাতো বটে।

রাঙিনাও রেগে গেলো। এতো যত্ন করে যার জন্যে রেঁধে আনলো সে ডিমটা, সে বলে কিনা দামড়িটাই বড়ো, সোহাগ লয়।

রাগের স্বরেই রাঙিনা বললে, দামড়ি তো আনেক জমায়ছিস। হাটে ধনিয়া বিকায়ে, সিমারি বিকায়ে দামড়ি মিলে নাই?

সঙ্গে সঙ্গে চুপসে গেলো যেন আকুম।

বললে, উ তো জুয়ায় গইলে গেছে। জুয়ায় হারে গেলাম বটে।

চোখ কপালে তুললো রাঙিনা।—জুয়ায় হারে যেছিস? মুন্‌শীর সুদটা দিতে হবেক নাই আজ?

আকুম চুপ করে রইলো।

মনটা খারাপ হয়ে গেলো রাঙিনার। তাড়াতাড়ি ভাত ক-টা খেয়ে নিয়ে দু-জনে হাট দেখতে বের হলো। কত রঙিন রঙিন গামছা, কাচের নানা রঙের জলচুড়ি। পয়সাগুলো থাকলে কতো কি কেনা যেতো।

মুন্‌শীর সুদ। কথাটা মনে পড়তেই শিউরে উঠলো রাঙিনা। সন্ধ্যে বেলায় গিয়ে হাজির হতে হবে মুনশীর ডেরায়। সুদ দিয়ে আসতে হবে।

আকুমও ভয় পায় গোপীচাঁদকে। বললে, মুন্‌শীর কাছকে তু রাঙিনা মাফি মাগবি যা।

—হুঁ। গম্ভীর হয়ে গেলো রাঙিনার সারা মুখ।

আকুমকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে ধীরে ধীরে গোপীচাঁদ মুন্‌শীর ডেরায় ঢুকলো রাঙিনা। আর তাকে দেখেই যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠলো মুন্‌শীর মুখ। কুলিকামিনেরা একে একে সুদ গুনে দিয়ে চলে গেলো।

রাঙিনা তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

সকলে চলে যেতে রাঙিনা বললে, সুদটা পরের হপ্তায় দিবো গো মুন্‌শী।

গোপীচাঁদ হাসলো। হেসে ইশারায় কাছে ডাকলো তাকে। বললে, সুদ কোন মাংতা!

পানা মান্‌কি গাসি মুণ্ডার সামনে টাঙিটা ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিলো, মায়েটা তুয়ার খাদানে পালায়ছেরে, দে কোঁপাই দে মায়েটারে।

শুনে প্রথমটা বিশ্বাসই হয় নি গাসির। সে নিজের মুখেই বিধান দিয়েছে, খাদানে কাজ করা পাপ, ধাওড়ায় বাস করা পাপ। অথচ তারই মেয়ে কিনা পালিয়েছে ওই কয়লাখাদে।

সকলের মুখের ওপর দিয়ে ক্রুদ্ধ বিস্মিত চোখজোড়া বুলিয়ে নিয়ে গেলো গাসি। সকলেই মাথা নিচু করলো সে চোখের দিকে তাকাতে না পেরে। আর তা দেখে গাসি বুঝতে পারলো পানা মান্‌কির কথাটা মিথ্যা নয়। সত্যিই পালিয়েছে রাঙিনা।

রাগে চিৎকার করে উঠলো গাসি।—মিছা নয়? মিছা নয় বটে মান্‌কির কথাটো? তুরা জানেপুছে লুকায় যেছিস?

সকলেই শুনলো, সকলেই চুপ করে রইলো। কি বলবে তারা এ প্রশ্নের উত্তরে। সকলেই তারা জানতো ঠিকই, জেনেশুনেও গোপন করে গেছে। কার সাহস হবে, এ কথা মুণ্ডার কানে তোলার। রাঙিনা পাপ করলেও গাসির মেয়ে।

রাগে দপ্‌দপ্‌ করে পঞ্চায়েতের বেদী ছেড়ে চলে গেলো গাসি।

সুখন আর সোমরী দেখলো কয়লাখাদের দিকেই চলেছে গাসি। দেখে ভয়ে শিউরে উঠলো সোমরী।

ছুটতে ছুটতে গাসির কাছে গিয়ে পথ আগলে সামনে দাঁড়ালো।

বললে, না বুড়া, যাবি না তু খাদান পানে।

থমকে দাঁড়ালো গাসি।—যাবোক নাই? পাপী কুড়িটোর কান্ধোখান কোঁপাই দিবোক নাই?

—না বুড়া, যাবি না তু। খাদানের বাবুরো গোঁয়ার মানুষ বটে, রাজা মানুষ বটে। উয়াদের কানুন আছে, বল আছে। ধাওড়ার কামিন বটে রাঙ্না, উয়ার পরে হুকুম দিলে লাপরার মানুষগুলা-কেই তুষী বলবে বাবুরো।

সুখনও ইতিমধ্যে ছুটে এসে দাঁড়িয়েছে গাসির সামনে।

গাসিকে সবল তুটি হাতে জড়িয়ে ধরে ফেরাবার চেষ্টা করতে করতে বললে, বাবুরা রাগে যাবে, আগুন লাগায় দিবে লাপরায়, ফিরা চ বুড়া। ফিরা চ।

অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর রাগ পড়লো গাসির। রাগ পড়লো, না ভয় পেলো। হয়তো সোমরীর কথাটাই তার রাগের আগুনে জল ছিটিয়ে দিলো। খাদানের বাবুরা রাজামানুষ, উঁয়াদের কানুন আছে! বল আছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে ফিরে এলো গাসি। কিন্তু মনের মধ্যে থেকে রাগ গেলো না।

আশ্চর্য, গাসিও সন্দেহের চোখে তাকাতো সুখনের দিকে। ভাবতো, এতো যখন লুকিয়ে লুকিয়ে খাদানের কাজ দেখতে যায় সাগুাটা, তখন দামড়ির লোভ জেগেছে নিশ্চয়। কোনদিন ফুরুৎ করে পালিয়ে যাবে সে।

তারই মেয়ে রাঙিনা কিনা পালালো সব প্রথমে। পয়সার লোভে নয়, মুণ্ডা গাঁয়ের রীতনীতের ভয়ে, পঞ্চায়েতের বিধানের ভয়ে।

একে একে শুনলো গাসি, রাঙিনা একা পালায় নি, পালিয়েছে আকুমের সঙ্গে। মেয়ে তার ঠিগিয়া হতে চেয়েছিলো আকুমের সঙ্গে। কিন্তু মত দিতে পারে নি গাসি। কি করে মত দেবে সে। বন পরিষ্কার করে নতুন ক্ষেত বানিয়েছে তারা বনের মধ্যে। তা বলে সত্যিই তো তারা বীর হড় নয়। বনের মানুষ নয়। সিল্লির মুণ্ডা তারা, মালগুজারি দেয়া পাপ বলেই পালিয়ে এসেছে। কিন্তু রীতিনীতি ফেলে আসে নি। ধরম অধরম ভুলে যায় নি।

বুড়াবুড়িদের কাছে গাসি শুনেছিলো এক সময় এতসব রীত-নীত ছিলো না তাদের। ধরম জানতো না, পাপ করতো কোনটা পাপ তা না জেনেই। বনের মানুষের মতোই থাকতো তারা। বিয়াসাদীর আগে পর্যন্ত ছেলে আর মেয়েরা নাকি রাত কাটাতো ঘুমঘরে। দিনের বেলায় যে-যার বাপমায়ের কাছে থাকতো, কাজ করতো। আর রাতে শুতে আসতো গিতিওড়ায়। কিল্লি ছিলো না তখন, করম অকরম বুঝতো না। পীরিত হলেই ঠিগিয়া হতো, ঠিগিয়া হলেই বিয়ে হতো।

এমন সময় বীরসা ভগবান এসে হাজির হলো তাদের সামনে। রাজার অত্যাচার থেকে বাঁচাবার জন্যে এসে দাঁড়ালো। আর দেকোদের দেশ থেকে রীতনীত শিখে এলো বীরসা ভগবানের চেলারা। চেলারা এসে বললে, মেয়েদের ওড়া আলাদা হবে, ছেলেদের ওড়া আলাদা হবে। বললে, বিয়ার পর আন্ সাগুার চাটাইয়ে শোয়া পাপ। বললে, বেটাবেটির বিয়া হবেক ভিন্ কিল্লিতে। এক কিল্লিতে বিয়া হলে বহিনকে বিয়া হয়। বললে, শুধা সাণ্ডিল কিল্লির বেটাবেটির বিয়া হবেক সাণ্ডিল কিল্লিতে।

. এমনি আরও অনেক নিয়মকানুন প্রচার করলো তারা। নতুন নতুন বিধান দিলো।

জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য মুণ্ডাদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো বীরসা ভগবান। ইংরেজের কারাগারে মৃত্যু বরণ করেছিলো। আর তাই বীরসাকে ভগবান নাম দিয়েছিলো তারা, বীরসা ভগবানের শিষ্যদের প্রতিটি কথাকে ভাবতো ধর্মবাক্য।

বিদ্রোহ শান্ত হবার পর মুণ্ডাদের অনেকে এ সব ধরম অধরমের কথা ভুলে গিয়েছিলো শাস্তির লোভে, ক্ষেতের ধানের লোভে। মালগুজারি দেয়া পাপ জেনেও রাজার ক্ষেতিজমি ছাড়ে নি, মাল-গুজারি দিয়ে সেই জমিই চাষ করেছে। আর অন্য সকলে মুণ্ডা

মান্‌কির কথা রক্ষা করেছে। বিধান মেনেছে। জমি ছেড়ে চলে এসেছে গভীর অরণ্যে। বন পুড়িয়ে নতুন জমি বানিয়েছে, বেশি ধানের লোভে মালগুজারি দিয়ে রাজার জমি চাষ করতে রাজী হয়নি।

যদি কিল্লির হিসেবই মানবে না, তো গাসি মুণ্ডা তার দলকে নিয়ে পালিয়ে আসবে কেন।

কিন্তু পালিয়ে এসেও যেন শান্তি নেই। সাহেবরা এসেছে, বাবুরা এসেছে এই গভীর বনের মধ্যেও। কয়লার খাদ খুঁড়তে শুরু করেছে।

তা খাদ বানালে আপত্তি নেই গাসির। আপত্তি বাবুদের কানুনে। তাদের দলের লোক যদি ইচ্ছে করলেই পালিয়ে যেতে পারে খাদে, কাজ করে খেতে পরতে পায়, তা হলে ধর্ম টিঁকবে কি করে? পঞ্চায়েতকে ভয় পাবে কেন লোকে। সকলেই তো পাপ করবে। জরিমানার মুর্গী শূয়োর দিতে চাইবে না সারনার সামনে। একঘরে হবার ভয় পাবে না।

দেখতে দেখতে কলাই বুনবার সময় এসে গেলো এদিকে। লোকগুলো তৈরী হয়ে আছে ক্ষেতে নাহাল দেবার জন্যে। দাহী চাষীর দল নাহালী হতে চায়। পানা মান্‌কি পথ দেখিয়েছে তাদের। চোখের সামনে দেখতে পেয়েছে তারা, দাহীর চেয়ে নাহালী হলে রোপাই ভালো হয়, ফসল বেশি হয়।

অসন্তোষের সৃষ্টি দেখতে পেয়েছে গাসি, সকলের চোখে। দেখতে পেয়েছে অসুর লোহারের ত্থ-ঘরে লোক চলাচল। নিশ্চয় নাহাল তৈরী হচ্ছে সেখানে।

নিজের মেয়েকেই যেখানে সামাল দিতে পারে নি সে, কি করে সামলাবে সমস্ত গাঁয়ের মানুষগুলোকে?

অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে গাসি ধীরে ধীরে সোমরীকে বললে, মুণ্ডার ধরমটা মিছা হয়ে যাবেক রে সোমরী, পাপের রীতটাই চালু হবেক লাগছে।

সোমরী হেসে বললে, ধরম টিঁকায় রাখবি তো রীতটার বদল কর ক্যানে।

—রীত বদল হবে? বিস্মিত হলো গাসি।

সোমরী হেসে বললে, হুঁ বিয়ার আগে বেটাবেটির জনম হয় তো বেটাবেটিরে ফেলায় দিতে হবে? এ রীত রাখিস তো পাপী মেয়েগুলান খাদানে ভাগবে। বল ক্যানে, পাপ করলে জরিমানা লাগবে, বিটলা হবেক নাই।

কথাটা বুদ্ধির কথা। জরিমানা চাইলে, জরিমানা দেবে সকলে। ধর্মও রক্ষা পাবে। কিন্তু কথায় কথায় একঘরে করার ভয় দেখালে সকলেই পালাবে খাদানে।

সোমরী চলে যেতেই গাসি মুণ্ডা ধীরে ধীরে পানা মান্‌কির ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

না, পানা মান্‌কির সঙ্গে শত্রুতা রেখে পঞ্চায়েত সামলানো যাবে না। তার চেয়ে তার সঙ্গে যুক্তি করে চলাই ভালো।

পানা মান্‌কিরও ভালো লাগলো কথাটা। নাহাল দিয়ে চাষ করলে ধান জরিমানা দিতে হবে। দেবে সে। আর সে দিলে, তবেই অন্য সকলেও নাহাল দিয়ে চাষও করবে, জরিমানাও দেবে। গাঁ ছেড়ে পালাবে না কয়লাখাদে।

পানা মান্‌কি দেখলে, গাঁ থাকলে, রীতনীত থাকলে তবেই না সে মান্‌কি হতে পারবে আবার। খাদে পালিয়ে গেলে সকলে এই বুড়ো বয়সে পানা কি করবে একা একা। তাকে তো আর খাদে কাজ দেবে না বাবুরা।

শেষ পর্যন্ত পঞ্চায়েত ডেকে কথাটা সকলকে জানিয়ে দিলো গাসি। বললে, ক্ষেতে নাহাল দিয়ে পাপ করলে ক্ষেতি পিছু এক ধামা ধান দিতে হবে জরিমানা।

কথাটা শুনিয়ে দেওয়ার সঙ্গে ভিড় বেড়ে গেলো অসুরদের ঘরে। লোহারী পাথরের স্তূপ জমে উঠলো লোহারদের ঘরের সামনে।

মাসখানেক পরেই দেখা গেলো শুধু পানা মান্‌কিই নয়, আরো অনেকে বলদ জুতে দিয়েছে লাঙলের আগে।

দেখতে দেখতে এদিকে পৌষপরবও ঘনিয়ে এলো।

সাঙারা পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞেস করে ঠিগিয়া হবে কিনা, কুড়িরা পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞেস করে বাপ্‌লার খবর।

ভর-যৌবন মেয়ে সোমরী। শরীরে এসেছে তার নতুন জাগার ছন্দ। তাই পট্টির সাঙারা লোভের চোখে তাকায় তার উদ্দাম স্বাস্থ্যের দিকে, মাংসের নাচন দেখে ঠাট্টা করে কেউ, কেউ বা নির্লজ্জের মতোই রসিকতার মাধ্যমে প্রার্থী হয়ে দাঁড়ায়। সোমরী শোনে, হাসে তাদের কথা শুনে, হেসে উড়িয়ে দেয়। হেলেদুলে কৌতুকের হিল্লোল ছড়িয়ে চলে যায় রসবতী নাগরীর মতো।

প্রেমের বাসনা নেই তার মনে এমন নয়। তার দেহমনও জুড়ি বাঁধতে চায়, শরীর চায় শরীরের আলিঙ্গন। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে মন বদলায় তার। একজনের ওপর থেকে আরেকজনে।

ঠিগিয়া হবার মানুষটাকে ঠিক ঠিক বেছে নিতে পারে না। কখনও এ সাঙাটা, কখনও ওটা। প্রজাপতির মতোই উড়ে উড়ে বসে এ-ফুলে নয়তো ও-ফুলে। কিন্তু মধু কোনটায় বেশি তার হিসেব নিতে নিতেই সময় কেটে যায়।

ভালো লাগে সকলকেই, তবু বিশেষ করে ভালো লাগে না কাউকে। আর সুখন? মনে মনে সুখন সম্বন্ধে ঔৎসুক্য কম নয় তার। এই একটা মানুষই ভালো করে দেখে এসেছে দূরের খাদানটা। দেখে এসে এমন সব গল্প করে যে বিস্ময়ে বড়ো বড়ো চোখ করে শোনে সোমরী। কিন্তু, এমন জোয়ান বয়সে, হাসে না কেন লোকটা? হাসতে জানে না? ফুর্তি জানে না?

রাত্রে ঘুম-ঘরে শুয়ে শুয়ে ভাবে সোমরী। একটার পর একটা মুখ ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে। এবারের এই পৌষপরবেই

যে তার মনের মানুষ বেছে নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তবু ঠিগিয়া হতে সাধ যায় সোমরীর।

চোখের সামনে দেখেছে সে রাঙিনা আর আকুমকে পালিয়ে যেতে। দেখেছে অন্যান্য কুড়িরা নিজের নিজের মানুষ বেছে নিয়ে পীরিত করে। যতো দেখে ততোই তার নিজের মনও উদাস হয়।

আর ক্ষণে ক্ষণে বাপ মা-র প্রশ্ন, বুড়হি হছিস, ঠিগিয়া হবেক নাই তুয়ার? বাপলা হবেক কি শরীলটা ভাঙে যালে?

সোমরী শোনে আর হাসে। কিন্তু মনে মনে একটা জ্বালাও যে না অনুভব করে তা নয়। তার চেয়ে বেশি বিরক্ত হয় সঙ্গী সাথীদের বিদ্রূপে।

তারা ঠাট্টা করে বলে, বিয়া করবে নাই সোমরী, উ কুসুম্বির ভামরা বটে, পট্টির সাঙাগুলাকে খারাপ করবে লাগছে।

শুনে ভেতরে ভেতরে জ্বলে ওঠে সোমরী। আর মন তৈরী করে ঠিগিয়া হবার জন্যে।

কেউবা ঠাট্টা করে বলে, পুরুষগুলান ই কাল্‌টি মায়েটোর দিকে নজর না দিলে উয়ার দোষটা কি বটে।

এ-কথা শুনে মরমে মরে যায় সোমরী। কোনো মানুষটাই যে তার মনে ধরে না তা যেন বুঝতে চায় না কেউ। ভাবে, সোমরীর শরীরেই রূপ নেই তাই কেউ তাকায় না তার দিকে।

ধীরে ধীরে মন ঠিক করে সোমরী। এদিকে চালগুঁড়ি সিদ্ধ করার মিঠে গন্ধে ভরে যায় সারা গাঁ।

তিনদিন ধরে চলবে পিঠাপরব, চলবে নাচ গান, মাণ্ডি মদ আর মাংস।

সোমরীর বাপ মা ভাই বোনেরাও মেতে উঠছে উৎসবের আয়োজনে।

ভোর-সকাল থেকে চলে পিঠে তৈরীর কাজ। কাজ শেষ করে দল বেঁধে মারাং গাড়ায় স্নান করতে যায় সকলে। স্নান সেরে এসে

গোল হয়ে বসে ওড়া বোঙার পুজোয়। নিজেরাই পুজো করে ফুল পাতা দিয়ে, পিঠা ভোগ দিয়ে।

তারপর শুরু হয় গান। বাপ মা ভাই বোনদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সোমরীও গাইতে শুরু করে। পাড়ায় পাড়ায় সব ঘর থেকেই গানের কলি ভেসে আসে। বাজে তিরগিয় বাঁশী আর তুমদা মাদল।

আধফোটা শাল পলাশের আগুনে ভরে গেছে সারা বন। মহুয়ার গন্ধে ভরে গেছে বাতাস।

হাত-তাঁতে বোনা নতুন কাপড় পরে ওড়া বোঙার বেদীকে ঘিরে বসে সকলে। মন্ত্র পড়ে সোমরীর বুড়া বাপ। মৃত আত্মীয় স্বজন, যারা প্রেতাত্মার রূপ নিয়ে আছে, তারা ঐ মন্ত্রের গুণে আবার মানুষ হয়ে জন্মাবে।

মন্ত্রপাঠ শেষ হয়, পুজো-আর্চা শেষ হয়।

এবার মেয়েগুলো সাজগোজ শুরু করে। খোঁপায় ফুল জড়ায় সোমরী, গলায় ফুলের মালা।

বনদেবী যেন এসে দাঁড়িয়েছে হঠাৎ।

পুরুষগুলো সেজেছে ময়ুর পেখমে; মাথায় রঙিন পালকের মুকুট, মুখে কারও বা অদ্ভুত মুখোশ।

দল বেঁধে এক সারি মেয়ে, পাশে পাশে এক সারি পুরুষ। তারপর সারনা তলায় পৌঁছে মেয়ে পুরুষ হাত ধরাধরি করে নাচে আর গায়।

পুরুষের দলটার দিকে তাকালেই বার বার চোখ পড়ে তার সুখনের দিকে। চোখোচোখি হয়। বেশ বুঝতে পারে সোমরী, সুখনও যেন ক্রমশ তার কাছেই এগিয়ে আসছে।

মনটা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

নাচের নেশায় সব কিছু ভুলে যায় সোমরী। তার পর হঠাৎ এক সময় দেখে, সুখনের হাত ধরেই নেচে চলেছে সে। এক ঝলক

লজ্জায় চোখ ঘুরিয়ে নেয় সোমরী, আর হাতটা আরও শক্ত করে ধরে সুখনের পুরুষ্টু হাতখানা।

দুপুরের দিকে নাচ বন্ধ হয়। এবার ভোজন-বেলা।

এ ওকে নিমন্ত্রণ করে।

সুখন বলে, আমারদের ওড়াকে চ সোমরী, পিঠা খাবি চ।

মনে মনে খুশি হয় সোমরী। তবু বলে, আমার বুড়া বাপটা বলবেক সুখনকে ডাকে লিয়ে আয়। আমি যাবো ক্যানে, তুই চ আমার সাথে।

শেষ পর্যন্ত সুখনই যায় সোমরীদের ডেরায়।

ছোলা, মুড়ি, চিঁড়ে, গুড়, মাংস আর ভাত। যে যা চায়। তার চেয়ে বেশি পিঠা। তার পর মদ আর মদ। মহুয়ার মদ, পচাই মদ। যে যতো পারে খায়, নেশা করে।

তারপর আবার নাচ আর গান।

গাইতে গাইতে চলে সুখন। ঠিগিয়ার রীতি মেনে।

আর সারনা তলার ফুলবাগিচায় এসে দাঁড়ায় সোমরী। একটা মোটা গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে লজ্জা শরমের অভিনয় করে। উঁকি দিয়ে দিয়ে তাকায় সুখনের দিকে।

সুখনও বাগিচার বাইরে দাঁড়িয়ে, বাগিচা চক্র দিতে দিতে গান গায়। ফিরে ফিরে তাকায়, গাছের আড়ালে যেখানে সোমরী দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে।

এটাই ঠিগিয়ার রীতি।

গাঁয়ের আরও অনেকে ভিড় করে দাঁড়ায় দূরে দূরে। দেখে আর অট্টহাসে হেসে ওঠে তারা।

ফুলের বাগানে ফুল নিয়ে নাড়াচাড়া করে সোমরী, কখনও খোঁপায় পরে। কখনও সুখনের দিকে ছুঁড়ে দেয়।

আর সুখন টেনে টেনে গায়।

নাম্‌দ-অ নেগাম্‌ সেঁনাইয়া
নাম্‌দ-অ নাপুম সেনাইয়া
কিলিমিলি বারা
তালারে সেনাসেঁয়া
নাইংদ নাপুম বাঙ্গাই
নাইংদ নেঙ্গাই বাঙ্গাই
কিলিমিলি বারা কুটিরিয়া ॥

অর্থাৎ

তোমার মা আছে
তোমার বাপ আছে
তাই নানা রঙের ফুলবাগানে
দাঁড়িয়ে আছো তুমি।
আমার মা নেই, বাপ নেই
তাই বাগানের বাইরে আছি আমি ॥

গান গেয়ে চলে সুখন, আর গান শুনতে শুনতে এক পা এক পা করে এগিয়ে আসে সোমরী। তারপর বাগিচার বাইরে এসে সেও সুখনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে শুরু করে। তারপর হাত ধরাধরি করে নাচতে শুরু করে দু-জনে।

উল্লাসে আনন্দে দু-জনের পরিবারের সকলে চিৎকার করে ওঠে। ঠাট্টা বিদ্রূপ শুরু করে কম বয়সের মেয়েগুলো।

এমনি ভাবে একে একে অনেকগুলো ছেলেমেয়ের মধ্যে ঠিগিয়া হয়ে যায়। বুড়ো বাপগুলো বসে বাপলার দিন ঠিক করবার জন্যে।

শুধু গাসি মুণ্ডা দেখে আর চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে তার। তার মেয়েটাও তো এমনি ভাবে ঠিগিয়া হতে পারতো। তা নয় শয়তান মেয়েটা আকুমের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে পাপ দিয়ে গেলো লাপরার মাটিকে

মুনশি গোপীচাঁদ হলো রাজামানুষ। ঠিকাদারদের সঙ্গে কুলি-কামিনদের দেখা হয় কম, কথাবার্তা আরও কম। শুধু এই একটা কোলিয়ারীর কন্ট্রাক্ট তো নয়, ঠিকাদাররা আজ এখানে কাল ওখানে কাজ দেখে বেড়ায়। কাজ যতো না দেখে তার চেয়ে বেশি দেখাশুনো করতে হয় সিণ্ডিকেটের এজেন্ট ম্যানেজার ইন্সপেক্টর সাহেবসুবোদের। বিল্ পাশ করানো, টাকা নেওয়া আর টেণ্ডারের রেট বাড়ানো হলো ঠিকাদারের কাজ। মুন্শিই আসল ঠিকাদার। কাজ দেখে মুন্শি গোপীচাঁদ, হপ্তার রোজ সেই দেয়। নতুন লোককে চাকরি দেওয়া আর যে-কোনো লোককে বরখাস্ত করায় তারই অধিকার।

এই কাজের ফাঁকেই দিব্যি মহাজনী ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে গোপীচাঁদ। সুদে টাকা খাটায় কুলিকামিনদের কাছে। ধার চাইলেই ধার দেয়, দুটো মিষ্টি কথাও বলে, কিন্তু সুদের টাকাটা ঠিক হপ্তার শেষে তার ডেরায় জমা না দিয়ে গেলে রক্ষে নেই। হয়তো কাজ থেকেই বরখাস্ত করে দেবে।

তাই গোপীচাঁদকে ভয় পায় সকলে।

রাঙিনার মনেও ভয় কম ছিলো না। হয়তো আরও টাকা ধার নিতে হবে তাকে, হয়তো দশ পনেরো দিন এমনিই কাজে যেতে পারবে না সে। কথাটা মনে পড়তেই আকুমের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিজের মনেই হাসলো রাঙিনা। আকুমটা মাথা হেঁট করে গোপীচাঁদের ডেরার দিকে হেঁটে চলেছে রাঙিনার পাশে পাশে।

তাজ্জব, আকুমটা এখনো টের পায় নি কিছু। বুঝতে পারে নি, নতুন কি স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে রাঙিনা। চেহারাটাও কি বদলায় নি তার? ধাওড়ার বুড়িগুলো তা হলে ঠাট্টা করে কেন। নিশ্চয়

বদলেছে। সে নিজেই তো বুঝতে পারে আগের মত আর চলন হালকা নেই তার, শরীরটা ভারী ভারী ঠেকে।

আকুমটা নেহাতই ছেলেমানুষ। রাঙিনা যে মা হতে চলেছে তা যেন দেখেও দেখে না।

তবু কথাটা স্পষ্ট করে বলতে পারে না রাঙিনা।

বলবে কি না ভাবছে রাঙিনা, হঠাৎ আকুম বললে, মুন্‌শিটারে বড় ডর লাগেরে।

পথ চলতে চলতেই রাঙিনা বললে, মুনশিটা নিঘ্‌ঘাৎ রাগে যাবে, দেখিস ক্যানে সুদ না দিলে মুনশি খাদানে জবাব দিবে।

আকুম শুনলো। চুপ করে রইলো। দোষ তো তারই, কি উত্তর দেবে সে এ-কথার।

শুধু ধীরে ধীরে বললে, আমি ইখানে দাঁড়ায় রইবো। মুন্‌শিটারে তুই বুঝায় বলিস।

আকুম দাঁড়িয়ে রইলো বাইরে। ডেরার ভেতর চলে গেলো রাঙিনা।

একে একে সকলেই সুদের পয়সা গুণে দিয়ে চলে গেলো। তখনও হিসেবের খাতার ওপর ঝুঁকে পড়া মুন্‌শির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো রাঙিনা।

অনেকক্ষণ পরে মাথা তুললো গোপীচাঁদ।

—ই হপ্তাটা বাকী করে দে মুন্‌শি। সুদের টাকাটা দিবার পারলাম নাই।

—সুদ কোন মাংছে? গোপীচাঁদের চোখ দুটো হেসে উঠলো। তারপর ইশারায় কাছে ডাকলো সে রাঙিনাকে।

এতো সহজে সুদ দিতে না পারার অপরাধ ক্ষমা করে দেবে গোপীচাঁদ? বিশ্বাস হলো না রাঙিনার। ভয়ে ভয়ে দূরেই দাঁড়িয়ে রইলো।

একটা হাত ধরে তাকে টেনে এনে খাটিয়ায় বসালো গোপীচাঁদ।

প্রশ্ন করলে, হপ্তার রোজ কি হলো তার, হাটের পয়সাই বা কি হলো।

গোপীচাঁদের হাসি দেখে একটু ভরসা পেলো রাঙিনা।

বললে, উ রোজের দামড়িগুলা তো মদের ভাঁটিতে গেছে। হাটে ধনিয়া আর সিমারি বিকায় সুদ দিবো তো মরদটা জুয়ায় হারে গেছে।

হাসলো গোপীচাঁদ।—জুয়া ?

তার কামিনগুলোর মধ্যে এই মেয়েটাই তাজা রক্তের মেয়ে। চেহারাটাও বেশ। তার শরীরের ভাঁজে ভাঁজে যেন লোভের হাতছানি দেখতে পায় সে। অনেক দিন থেকেই মেয়েটার ওপর নজর আছে তার।

কিন্তু সাহস হয় নি। অন্যমেয়েগুলোর মতো দুটো পয়সা ফেলে দিয়ে ডেরায় ডাকলেই এসে হাজির হবে না হয়তো। কামিনগুলো খাদে কাজ করে করে খাদের হালচাল বুঝে গেছে। কিন্তু রাঙিনা হলো বুনো। সবে এসেছে গাঁ ছেড়ে। অকুমটাও তাই। ইজ্জতে হাত বাড়ালে হয়তো টাঙি নিয়ে ছুটে আসবে।

বুধন সর্দার সাবধান করে দিয়েছে, মনে পড়লো গোপীচাঁদের।

বলেছে, ই আসল মুণ্ডা বটে, দেকোদের সাথে মিশে নাই, হালচালে পাপ ঢুকে নাই উদের।

অর্থাৎ সমতলভূমির মানুষদের সঙ্গে মেশে নি বলেই পাপ করতেও শেখে নি।

মনে মনে হাসলো গোপীচাঁদ। অন্য মেয়েগুলোও কি একদিনেই এসেছে ? টাকার লোভে এসেছে, খেতে না পেয়ে এসেছে। সকলেই তো একদিন বুনো ছিলো এরা। খাদে নেমে যাওয়া সহজ, উঠে আসাই শক্ত।

সে নিজেও কি ইচ্ছে করে পাপের পথে নেমেছে ? কয়লাখাদে কাজ করতে হলে মনটাকেও ময়লা করে নিতে হয়। ব্রহ্মচারী তো

নয় সে, সংসারী। তারও বৌ ছেলেমেয়ে আছে। এজেণ্ট সাহেবের মতো, ম্যানেজার সাহেবের মতো। দূর বিদেশে তারা পড়ে আছে বলে মনকে সান্ত্বনা দেওয়া যায়, শরীর রাজী হবে কেন?

আর এজেণ্ট সাহেবের মতো একটা মেয়েকে নিয়ে থাকতে চায় না গোপীচাঁদ। ডেরার ইজ্জত নেই? তাছাড়া ওতে মায়া পড়ে যায় একজনের ওপর। দায়িত্ব এসে যায়। তার চেয়ে—

রাঙিনাকে পাশে বসিয়ে তার ঘাড়ে একখানা হাত রেখে গোপীচাঁদ জিজ্ঞেস করলো, তো এ হপ্তা ভুখা মরবি?

—উঁ? কথাটা বুঝতে পারলো না রাঙিনা। চোখ তুলে তাকালো।

গোপীচাঁদ যে কাছে এনে বসিয়েছে, তার ঘড়ে হাত রেখে এমন মিষ্টি করে কথা বলছে এতেই খুশি সে। মুন্‌শির ব্যবহারের মধ্যে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য আছে বলে মনেই হলো না।

পুরুষমানুষ গায়ে হাত দিলেই ধরম নষ্ট হয় না। সুদ দিতে পারবে না জেনেও গোপীচাঁদ যে তার সঙ্গে এতো ভালো ব্যবহার করছে তা দেখে মনে মনে একটু গর্বও বোধ করলো রাঙিনা।

বলতে হবে আকুমকে। আকুম হয়তো বিশ্বাসই করবে না, ভাববে মুন্‌শি তাকে গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে।

গোপীচাঁদ বুঝলো ওর কথাটা বুঝতে পারে নি রাঙিনা।

তাই আবার প্রশ্ন করলে, ই হপ্তাটা ভুখা থাকবি, জুয়ায় হারে গেছিস তো পেট কি মুন্‌শি গোপীচাঁদ আছে, মাফি দিয়ে দেবে?

রাঙিনা হেসে উঠলো খিলখিল করে।—পেট ওজরটা শুনবে ক্যানে। ঘরে ধনিয়া আছে, তোর খাদানে হুড়ুটো দিবে।

—খাদানের চালে পেট ভরবে?

রাঙিনা চুপ করে রইলো। কথাটা মিথ্যে নয়। খাদে যে চাল দেবে সে-চালে কি পেট ভরবে? আর চালটাই তো সব নয়, মাণ্ডি মদটা না পেলে শরীর থাকবে কেন?

গোপীচাঁদ পকেট থেকে কয়েক আনা পয়সা বের করে দিলো রাঙিনাকে। হেসে বললে, সুদটা বাড়ে গেল!

—হুঁ! মৃদু হেসে পয়সাগুলো নিয়ে উঠে দাঁড়ালো রাঙিনা। বললে, মরদটা দাঁড়ায় আছে ডেরার ঝাঁপি ধরে।

কথাটা শুনে হঠাৎ যেন চুপসে গেলো গোপীচাঁদ। তাকালো কপাটের দিকে।

রাঙিনা ততক্ষণে তরতর করে বেরিয়ে এসেছে। বেরিয়ে এসে আকুমের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে দ্রুত পায়ে চলতে শুরু করেছে ধাওড়ার পথে।

আঁকাবাঁকা অসমতল পাথুরে রাস্তা। কোথাও ঢল নেমে গেছে, আবার কোথাও বা খাড়াই উঠেছে।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে তখন। দূরের ধাওড়াটা অন্ধকারে মিশে গেছে। আবছা অন্ধকারে শুধু দেখা যাচ্ছে খাদের মুখে টিপলার আর যন্ত্রপাতি। আর মাথার ওপর রোপওয়ে।

চলতে চলতে আকুম প্রশ্ন করলে, সুদটা মাফি করে দিছে মুন্‌শি?

—হুঁ। জুয়া খেলবি নাই তু, আবার ধার লিয়ে আয়েছি।

বলে পয়সাগুলো দেখালো রাঙিনা।

খুশি হয়ে উঠলো আকুম। বললে, মুন্‌শিটা মানুষ ভালো বটে, রাজা মানুষ মুন্‌শিটা।

দ্রুত পায়ে ধাওড়ার দিকে যেতে যেতে দূর থেকেই হঠাৎ চিৎকার হট্টগোল শুনতে পেলো রাঙিনা।

থমকে দাঁড়িয়ে কোনদিক থেকে আওয়াজটা আসছে শুনলো সে, তারপর ধীরে ধীরে বললে, জুয়ার ঝামেলা লাগছে।

হ্যাঁ, জুয়ার হট্টগোলই বটে।

ধাওড়ায় ঢুকতেই সাঁওতাল পট্টি। সেখানেই ভিড় করে এসেছে কুলিকামিনের দল।

ব্যাপারটা কি? ব্যাপার আর কিছুই নয়, ছিদান কিস্কু জুয়ায় হেরে গিয়ে গত সপ্তাহে তার বৌকে বেচে দিয়েছিলো সোনাত মাঝির কাছে। এ সপ্তাহে টাকা শোধ দিয়ে বৌকে ফিরে চাইছে, কিন্তু বৌটা ফিরে আসতে রাজী হচ্ছে না।

আকুম আর রাঙিনা ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে গেলো।

ছিদান কিস্কু তখন সোনাত মাঝির ডেরার সামনে দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করছে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন ছিদানকে বললে, বৌটাকে বিকায় দিয়ে এখুন চিল্লাস ক্যানে?

—বিকাইছি? চটে গেলো ছিদান, সোনাত মাঝির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, উ বেইমানটা কয়ে দিক না ক্যানে, বিকাইছি? জুয়ায় হারে গেলাম তো বন্ধুক রাখলাম হাটে, এখুন ফিরায় দিবে না ক্যানে?

বেচে তো দেয় নি, বন্ধক রেখেছিলো। টাকা ফেরত দিলে বন্ধকী মাল ফিরিয়ে দেওয়াই তো রীতি।

ছিদান চিৎকার করে জটলার দিকে তাকালো, ঘটিটো বাটিটো বন্ধুক রাখলাম তো ফিরায় দিবে না?

সোনাত মাঝিও রেগে গেছে। সেও এগিয়ে এলো।

বললে, ক্যানে দিবো নাই।

—গরুটো ছাগটো বন্ধুক রাখলাম তো ফিরায় দিবে নাই?

—হাঁ দিবো।

ছিদান যেন যুক্তিতে জিতে গেছে এমন ভাবে তাকালে।—জমি-জিরাত গরু ছাগ ফিরায় দিবি আর বৌটো ফিরায় দিবি না ক্যানে? গরু ছাগ আমার, আমার বৌটো আমার লয়?

ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা চাপা গুঞ্জন উঠলো। ছিদানের কথা-টাই তো ঠিক। জমিজিরেত, গরু ছাগ যেমন আমার হকের ধন, তেমনি বৌও তো আমারই সম্পত্তি। বন্ধক রেখেছি, ফেরত দেবে না কেন।

সোনাত মাঝি এগিয়ে এলো। চিৎকার করে বললে, আমি তারে বাঁধে রাখছি? তুয়ার বৌটো যাতে চায় নাই তো আমি দুষী হলাম বটে?

অর্থাৎ বৌটা যদি না ফিরে যেতে চায় তো সোনাত মাঝির দোষ কি!

সোনাত মাঝি ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বিচার চাইলে।—তুরাই বিধান দে ক্যানে!

ছিদান কিস্কু চেঁচিয়ে উঠলো, বিধানটা দিবে কি, বিধান কি দিবে? আমার ধন আমি ফিরায়ে লিবো। তুয়ার গরুটো আমার ঘরে আসে খোল ভুঁষি খায়ে বলবেক, ফিরবো নাই, তো গরু আমার হবেক?

জনতা ছিদানের পক্ষেই মাথা নাড়ছিলো, ছিদানের কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠলো। সত্যিই তো, একজনের গরু যদি আরেকজনের গোয়ালে গিয়ে বেশি খেতে পায়, তা হলে সেও তো ফিরতে চাইবে না। তা বলে গরু তার হয়ে যাবে?

ছিদানের বৌটা এতক্ষণে ডেরার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। কোলে মাস কয়েকের একটা বাচ্চা।

দুম করে ছেলেটাকে মাটির ওপর বসিয়ে দিয়ে বললে, তুয়ার বেটা তুই লিয়ে যা। আমি তুয়ার মার খেতে লারবো। আমি তুয়ার হাঁড়িয়া বানাতে লারবো, আমি তুয়ার ভাত রাঁধতে লারবো। তুই জুয়ায় হারে যাবি, মাতাল হবি, আমি পেটে ভুখা রয়ে তুয়ার ঘর রাখতে লারবো।

ধাওড়ার লোকগুলো এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝলো। সত্যিই তো, প্রতিদিনই ছিদান কিস্কু মদ খেয়ে এসে চিৎকার করে, মারধোর করে বৌটাকে। জুয়ার নেশায় কাজে যেতেও ভুলে যায়। কি খেয়ে থাকবে বৌটা?

আকুমের কাছে ঝামেলাটা খারাপ লাগছিলো।

রাঙিনাকে টেনে নিয়ে বললে, চ ঘরকে চ রাঙ্‌না, উদের কাজিয়া উয়ারা বিচার করুক গিয়া।

রাঙিনা কৌতুকে হেসে উঠে বললে, জুয়ায় হারে গিয়ে আমারে বন্ধুক রাখবি? লতুন মানুষ মিলবে বটে। বলে সশব্দে আবার হেসে উঠলো সে।

তারপর ভিড় ছেড়ে ওড়ার দিকে যেতে যেতে রাঙিনা বললে, মুণ্ডা আর সাঁতাল আর ওঁরাও সব মানুষগুলাই এক রে, সব মানুষগুলাই এক।

শুধু সুখন আর সোমরী নয়, জুড়ি বাঁধলো আরো অনেকে। বিলিয়া আর ফুল্‌কিও। ঘুমঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিজের নিজের মানুষ বেছে নিয়ে ঠিগিয়া হলো।

সুখন আর সোমরী, বিলিয়া আর ফুল্‌কি।

সুখন শুনেছিলো পানা মান্‌কির কাছে। তাই ঠাট্টা করে বললে, এ বিলিয়া, লজর রাখেছিলি রাঙ্‌নার উপর, ছুধেল ফুল্‌কিটারে বেছে লিলি শ্যাষে?

—ফুল্‌কি ছিটায় গেলে তো রাঙা হয় বটে আগুনটো। হাসলো বিলিয়া।

ফুল্‌কিও হেসে উঠলো। মনে মনে একটু যেন গর্বও হলো তার।

শুধু ফুল্‌কি নয়, ঠিগিয়া হওয়া মেয়েগুলোর যেন গর্বে মাটিতে পা পড়ে না। হেলেদুলে চলে, কথায় কথায় ধাঁধার ভাষায় প্রশ্ন করে পরস্পরকে, ধাঁধার ভাষায় উত্তর দেয়। সন্ধ্যে হলেই নাচ আর গান।

ছেলেমেয়েরা জুড়ি বেঁধেছে, সে খবর সারা গাঁ জেনে গেছে পরবের নাচ দেখে। কিল্লির বাধা নেই যখন, মত দিয়েছে বাপ মা।

এবার মেয়ের বাপ মা ঘন ঘন ভোজ দেবে ছেলের বাপ মাকে, ছেলের বাপ মা পেট ভরে মেয়ের বাপ মাকে খাওয়াবে মদ আর মাংস।

যথারীতি মুণ্ডা মান্‌কির বিধান জেনে বাপলাও হয়ে গেলো দিনক্ষণ দেখে। সোমরী গিয়ে উঠলো সুখনের ডেরায়। আর ঘুমঘরের চার দেয়ালে বন্দী থাকতে হবে না তাকে।

খুশিতে আনন্দে মদে চুড়চুড় হয়ে রইলো সুখনের বাপ আর মা। সুখন আর সোমরী প্রসাদ পেলো নেশার।

কয়েকটা মাস কেটে গেলো আনন্দে হাসিতে, ঠাট্টায় রসিকতায়।

তারপর হঠাৎ একদিন সুখন টের পেলো, গোলার ধান ফুরিয়ে এসেছে। ক্ষেতজমি তো সেই খুঁটিদাররা বেঁধে দিয়েছে, সুখন বিয়ে করে একটা মানুষকে নিয়ে এসেছে বলে তো জমি বাড়িয়ে দেবে না।

ভুনো ফসলের সময় এলে ভালো করে ক্ষেত চষবে সে, দাহী চাষীর মতো শুধু মাটির ঢেলা ভেঙে নয়, নাহাল দিয়ে মাটি চষবে, ধান হবে দ্বিগুণ। বীজ ছড়াবে না, রোপাই করবে পানা মান্‌কির মতো। সিল্লির সেই গোহিন্দ গোঁসাইয়ের মতো। দেকোদের কাছ থেকে নাহাল দিতে শিখে এসেছিলো গোহিন্দ, আর তার কাছ থেকে শিখেছিলো পানা মান্‌কি।

সোমরী ওর দুশ্চিন্তা দেখে বলে, বাপের ঘরকে পাঠায় দে আমারে, তার ক্ষেতি আছে, গোলা আছে, একটো মানুষের প্যাট ভরে যাবে সেথায়।

সুখন রাজী নয়। বাপ্‌লার পর একটা বছরও ঘুরতে না ঘুরতে বাপের ডেরায় পাঠাবে সে তার ঘর-গম্‌কেকে? ইজ্জত থাকবে না তা হলে।

তবে?

সুখন ফিসফিস করে বলে, ধান কর্জ লিবো পঞ্চায়েতের কাছে।

সোমরী নাক বেঁকায়, বলে, কর্জ শুধবার লাগবে নাই?

—উ একটো উপায় বাতলে দিবো, ডরাস ক্যানে।

—উপায়টো কি বটে? আমায় বিকায় দিবি?

সশব্দে হেসে ওঠে সুখন। বলে, হুঁ হাটে বিকায় দিবো,

খাদানের হাটে। কিন্তুক তুয়ারে লয়, আমার ক্ষেতিতে বিলাইতি লাগাবো, বিলাইতি বিকাবো, সিমসিমারি বিকাবো।

ঘরে মুর্গী আছে, মুর্গী আর ডিম বেচে দিয়ে আসবে হাটে। কিন্তু বিলাইতি ?

সোমরী বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করে, বিলাইতিটা কি বটে ?

সুখন হাসে।—কিছু বুঝিস না তুই, মুণ্ডা সান্তাল আছিস।

সোমরী হেসে উত্তর দেয়, তো কি মিছা বটে ? মুণ্ডা বটি, মুণ্ডা বাপের বেটি বটি। তুই কি দেকো হঁয়েছিস ?

—হবো নাই ক্যানে ? খাদানের বাবুদের থিকা বিলাইতির বীজ আনবো, বিলাইতি বিকায় আসবো খাদানের হাটে, দামড়ি মিলবে অনেক···

—দামড়ি ? বুঝতে পারে না সোমরী। দামড়ি তো ধানের মাপ, না বুঝবারই কথা।

সুখন হেসে ফেলে সোমরীর অজ্ঞতায়। বোঝায় তাকে, খাদের মুণ্ডা ওঁরাও সাঁওতাল কুলিরা পয়সাকে বলে দামড়ি। যা দিলে দোকানী পছন্দমত যে-কোন জিনিস দেয়। গোলায় ধান নেই তো পয়সা থাকলেই সব পাওয়া যাবে। আর পাওয়া যাবে বিলাইতি বেচে।

লাল টুকটুকে বেগুন, তার নাম বিলাইতি।

সুখন বলে, বিলাইতি বলে, টমাটর বলে। হাটে নিয়ে গেলে বাবুরা ঝমক ঝমক দামড়ি ফেলায় দেয়, লুটে লিয়ে যায় সব।

—হুঁ ? অবিশ্বাসের হাসি হাসে সোমরী। তারপর ধীরে ধীরে বলে, কিন্তু পঞ্চায়েত কইছে খাদানের হাটে সিমসিমারি বিকায় দিলে পাপ হবেক।

—পাপ হবেক ! রেগে গিয়ে সোমরীর কথাটারই প্রতিধ্বনি করে সুখন। বলে, পঞ্চায়েতটা বড়ো বটেক না প্যাটের খিদাটা

বড়ো ? পঞ্চায়েতের লোক কি হাটে যায় ? জানবে নাই পঞ্চায়েত, গাসি মুণ্ডাও জানবে নাই।

অনেক ভেবে শেষ পর্যন্ত সায় দিলো সোমরী। সত্যিই তো, হাটে তো কেউই যায় না। জানবে কি করে পঞ্চায়েত। পেটে না খেয়ে পঞ্চায়েতকে খুশি রাখলেই তো চলবে না। এদিকে মানুষ যে আরো বাড়তে চলছে, সে কথাও তো ভাবতে হবে।

হঠাৎ নিজের মনেই হেসে ফেলে সোমরী, কি একটা কথা মনে পড়তে।

সুখন প্রশ্ন করে, হাসিস ক্যানে ?

সোমরী মাথা নীচু করে লজ্জায়। তারপর ধীরে ধীরে বলে, বিলাইতিটা কেমন বটে ? রাঙা পানা ?

—হুঁ।

—খুব সোন্দর বটে ?

—হুঁ।

হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে সোমরী বলে, তো বেটি হলে নাম রাখবো বিলাইতি। খাদানের বাবুগুলার বেটিদের পানা রাঙা হবে, সোন্দর হবে।

সুখন মৃদু হেসে বলে, বোঙারা খুশি হলে রাঙা হবে বেটিটা। কিন্তুক বেটা হবেক নাই ক্যানে ?

সোমরী আবার ফিসফিস করে হেসে উঠে বলে, বেটা হলে তারে টমাটর নাম দিব বটে।

ঘরের সামনে অনেকখানি জায়গা ঘিরে নিয়ে বিলাইতির চাষ শুরু করলো সুখন। হাট থেকে পাকা টমাটোর বীজ কুড়িয়ে এনে নিজের ক্ষেতে বুনে দিলো। সুখন আর সোমরী, দুজনে মিলে পাথুরের মাটি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে নরম করলো। গাড়া থেকে জল এনে ঢাললো, মাটি কেঁপে উঠলো পূর্ণযৌবন মেয়ের মতো। মাটির মতোই সোমরীর দেহেও স্বাস্থ্যের জোয়ার এসেছে কোন ফাঁকে।

ক্রমে ক্রমে, মাসের পর মাস কখন কিভাবে কেটে গেছে স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে। পরিপূর্ণ মাতৃত্বের আবেশে দৃষ্টি উদাস হয়েছে, চলন শিথিল হয়েছে। তবু উৎসাহের অন্ত নেই। শরীরের ভার ক্লান্তি এনেছে দেহে, কিন্তু মন তেমনই চঞ্চল। বিলাইতির ক্ষেতে হরহর করে গজিয়ে উঠেছে চারা গাছগুলো, ফুলে উঠেছে। তারপর ফুল ফুটেছে, ফল ধরেছে।

সে কি আনন্দ দুজনের। সারা দুপুর চাঁদিফাটা রোদে ক্ষেতে বসে তাকিয়ে থেকেছে চারাগুলোর দিকে। হাওয়ায় শিরশির করে পাতা নড়ে, আর আড়াল থেকে দেখা দেয় বেগুনীরঙের ফুলগুলো। সবুজ সবুজ ফল।

ধৈর্য হারায় সোমরী।—টমাটরগুলান রাঙা হবেনি? উ তো হারা হয়েছে।

সুখন বোঝায়, বিলাইতি প্রথমটা সবুজই হয়, ক্রমশঃ লাল হয়ে উঠবে। টুকটুকে লাল।

প্রথম যেদিন একটা বিলাইতি লাল হয়ে উঠলো, চোখ পড়লো সুখনের। পাতার ফাঁকে ফাঁকে যেখানে যেখানে পোঁকা হয়েছে সেগুলো ছিঁড়তে ছিঁড়তে সুখন হঠাৎ দেখলো একটা টমাটো বেশ লাল হয়ে উঠেছে। রসে ভরে উঠেছে।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো সুখন। সোমরীকে ডাকতে গিয়ে থেমে গেলে। মনে পড়লো, গাঁয়ের মেয়েদের সঙ্গে বনে জ্বালানী কুড়োতে গেছে সোমরী।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলো। শেষে অধৈর্য হয়ে উঠলো সুখন। মনে একটু দুশ্চিন্তাও উঁকি দিলো। দলের সঙ্গে বনে যেতে না দিলেই যেন ভালো ছিলো। কিন্তু বাপ মা তার কিছু ভাবতে পারে, দলের লোক ঠাট্টা করবে এই ভয়ে বাধা দেয় নি। এমন তো হামেশাই যায় মুণ্ডা মেয়েরা। পূর্ণগর্ভা নারীর শরীর ভার হয়

বটে, কিন্তু শক্তি বাড়ে। এক বোঝা জ্বালানী আনা কি এমন কষ্ট। ও তো সব মেয়েই পারে।

চিন্তা সেজন্যে নয়। সুখন অধৈর্য হয়ে উঠলো সোমরীকে লাল টুকটুকে বিলাইতিটা দেখাবার জন্যে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে নিজেই টাঙিটা কাঁধে ফেলে বনের দিকে পা বাড়ালো সে।

মারাংগাড়া পার হয়ে পাহাড়ের কাছে পৌঁছেই ছেলে মেয়েগুলোর চিৎকার হাসি কানে এলো সুখনের।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পেলো দলটা পাহাড়ী পথ বেয়ে নেমে আসছে।

আঁকাবাঁকা রাস্তাটার মোড়েই দাঁড়িয়ে পড়লো সুখন। ততক্ষণে দলটা সামনে এসে পড়েছে।

—আও, বেটার ডাক শুনা বাপটো ছুট্যা আয়ছেরে।

বলেই হেসে গড়িয়ে পড়লো বিলিয়ার বৌ ফুল্‌কি।

বুঝতে না পেরে সপ্রশ্ন চোখে তাকালো সুখন।

ফুল্‌কি হাসতে হাসতে বললে, বেটা হয়েছে রে তুয়ার, বেটা হয়েছে।

সোমরীও ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছে, কোলে সদ্যজাত শিশু। দেহে, দেহবাসে নবজাতকের রক্তিম স্মৃতিচিহ্ন।

এমন তো প্রায়ই হয়। বিস্মিত হবার কিছু নেই।

ফুল্‌কি ততক্ষণে সোমরীর কোলের ছোট্টো শিশুর মুখ ভালো করে ঢেকে দিয়েছে কাপড়ের আঁচল দিয়ে।

ফুল্‌কি বললে, বেটার মুখটা দেখিস নাই, বুড়ো বাপটা আগে দেখবে।

অর্থাৎ সুখনের বাপ আগে দেখবে নাতিকে। তারপর ওঝা এসে মন্ত্র পড়বে। মান্‌কি পুজো দেবে সারনায়। তবে তো ছেলের মুখ দেখতে পাবে সুখন।

আরেকটা মেয়ে একটা রক্তাক্ত বাঁশের ছুরি এগিয়ে দিলো সুখনের দিকে। বললে, সে ছিলাটা রাখে দে তুয়ার কাছে। ওড়ায় গাড়তে হবেক।

ছোট্টো একটুকরো বাঁশের ছিলে, সুখনই বানিয়ে দিয়েছিলো। বানিয়ে দেওয়াই রীতি। ছিলেটা সব সময় গর্ভবতী মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে রাখে। নববধূর কাজললতার মতো, সন্থবিবাহিত বরের জাঁতির মতো। মাঠেঘাটে কখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে তার তো ঠিক নেই। তখন মা নিজেই বন্ধন ছিন্ন করবে। শিশুকে কোলে নিয়ে ফিরে আসবে ডেরায়।

ছিলাটা ওড়ার মধ্যে পুঁতে ফেলতে হবে তাড়াতাড়ি। তরতর করে ওড়ার দিকে এগিয়ে চললো সুখন। পিছনে ফুল্‌কির কাঁধে ভর দিয়ে সোমরী, কোলে মুখঢাকা ছোট্টো শিশু।

ডেরায় এসে পৌঁছতে পৌঁছতে খবর রটে গেলো সারা গাঁয়ে। হাসি আর আনন্দের হিল্লোল উঠলো।

বেটি নয়, বেটা হয়েছে সুখনের।

ছেলের মুখটা দেখবার জন্যে ছটফট করে সুখন। এদিকে তখন আচারবিচার চলছে। মন্ত্র আওড়াচ্ছে ওঝা। যাতে শয়তান কোনো বোঙা না ভর করে অসহায় শিশুর ওপর। কোনো ডাইনীর দৃষ্টি না পড়ে।

পানা মান্‌কি আর গাসি মুণ্ডাও এসে হাজির হয়েছে।

পানা বললে, ছিলাটা ওড়ায় গাড়ে দিছিস?

—হঁ।

—মাটি চাপায়ছিস?

—হঁ।

ভালো করে মাটি চাপা না দিলে নাড়ীর রক্তক্ষরণ বন্ধ হবে না। ভালো করে মাটি চাপা দিয়েছে সুখন।

কিন্তু ছেলের মুখ কি সে দেখতে পাবে না?

পাকা বিলাইতিটা গাছ থেকে তুলে এনেছে সে, লুকিয়ে রেখেছে কাপড়ের আড়ালে। সোমরীকে মনে পড়িয়ে দিতে হবে। মেয়ে হলে বিলাইতি নাম রাখবে বলেছে সোমরী, ছেলে হলে টমাটর।

পুজো-আর্চা শেষ হতে ডাক পড়লো সুখনের।

বাপ মা, গাঁয়ের সকলে সরে গেলো। এখন থাকবে শুধু সুখন আর সোমরী।

ঘরে ঢুকে সুখন দেখলো সোমরী শুয়ে আছে চাটাইয়ের ওপর। পাশে শিশুর মুখে আঁচল ঢাকা।

সুখন ঢুকতেই মৃদু হেসে ঢাকাটা সরিয়ে দিলো সোমরী। বললে, রাঙাপানা বেটা হঁয়েছে।

সুখন হেসে বিলাইতিটা বের করে দেখালে

বললে, বিলাইতির পানা রাঙা হঁয়েছে বটে।

সোমরী পাকা লাল টুকটুকে বিলাইতিটার দিকে একবার, আর সদ্যজাত শিশুর রক্তিম মুখের দিকে একবার তাকিয়ে সুখনের দিকে সহাস্য চোখ তুলতেই সশব্দে হেসে উঠলো সুখন।

সোমরী হেসে বললে, তুয়ার টমাটর হাটে বিকায় দিবি, আমার টমাটর রাখবো বটে, হঁ!

সুখন বিলাইতিটা সোমরীর মুখে গুঁজে দিলো, খায়ে লে ক্যানে, খায়ে লে, তেজ বাড়বে বটে, তেজী হবি, খায়ে লে।

জোর করে সেটা সোমরীকে খাইয়ে দেয় সুখন। শরীরে রক্ত বাড়বে। প্রসূতির শরীরে রক্ত দরকার। বাবুরা বলে টমাটর খেলে নাকি শরীরে রক্ত বাড়ে।

লাপরার কোলিয়ারী তখন ক্রমশঃ জেঁকে উঠছে। শত শত কুলিকামিনের শাবল আর গাঁইতির ঝঙ্কারে নয়, পাতালপুরীর দৈত্যটায় পায়ের শৃঙ্খল ভাঙছে যেন।

সুদীর্ঘ একটা দীঘি। ধাপে ধাপে শূণ্যগর্ভ দীঘিটা পাঁতালে নেমে চলেছে। মাটির স্তর থেকে নেমেছে বালির স্তর, তারপর নানা রঙের পাথরের স্তর ক্রমশ কালো হতে হতে গিয়ে পৌঁছেছে কালো কয়লায়।

দু-জোড়া ট্রলী লাইন নেমে গেছে সেই গভীরতায়। অবিরাম গতিতে চলছে শাক্‌শন পাম্প। যেখানে যেখানে জলের ফোয়ারা দেখা দিয়েছে সেখান থেকে জল পাম্প করে তুলে ফেলা হচ্ছে। উঁচু-নীচু পাহাড়ী ঢল বেয়ে নতুন একটা সরু নদী জেগে উঠেছে। খাদের মাথা থেকে এঁকেবেঁকে গিয়ে মারাং গাড়ায় মিলেছে সেটা।

নীচে, খাদের গভীরে শুধু অন্ধকার। চারিপাশে কালো কয়লার দেওয়াল। ব্লাস্টিং চলে নতুন নতুন প্লটে। গাঁইতির পর গাঁইতি পরে। মেয়েরা ঝুড়ি বয়ে কয়লা তুলে দেয় ট্রলী লাইনের বাকেটে। রোপওয়ের আকর্ষণে ভর্তি বাকেটগুলো উঠে আসে সারি সারি, টিপলারে মাল ঢেলে দিয়ে আবার নেমে যায়। টিপলারে কয়লার স্তূপ জমে ওঠে পাহাড়ের মতো। সেখান থেকে রোপওয়ের বাকেটে ঝুলতে ঝুলতে মাল চালান যায় বনের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে মাথার ওপর দিয়ে দুলতে দুলতে। দূরের সাইডিং-এ ওয়াগন ভর্তি হয়ে চলে যায় দেশ দেশান্তরে।

খাদের কুলিরা অতশত খবর রাখে না। মাটিকাটারী থেকে মালকাটারী হতে পারলে দু-দশ পয়সা বেশি রোজগার হবে, সেই স্বপ্নই দেখে তারা। মুন্‌শিকে খুশী করে চলে। খাদের বাবুদের,

ম্যানেজার সাহেবকে ভয় করে চলে। বন্দুক আছে তাদের, রাজার কানুন আছে। তার চেয়ে বড় অস্ত্র আছে তাদের হাতে। তামার পয়সা। দামড়িটা বাবুদের হাতে আছে, মুন্‌শি ঠিকাদারদের হাতে আছে। ম্যানেজার সাহেবের হাতে আছে। রাজামানুষ তারা, রাজার মতোই তাদের ভয় পেতে হয়।

আকুমও ভয় পায়।

ভোঁর না হতেই খাদের ভোঁ বাজে। তাড়াতাড়ি কাজে বেরিয়ে পড়ে সকলে। দল বেঁধে ধাওড়া থেকে বের হয় পুরুষ আর মেয়েগুলো। ওঁরাও মুণ্ডা সাঁওতাল।

দল বেঁধে গান্ গাইতে গাইতে চলে মেয়েগুলো, কাঁধ ধরাধরি করে। কখনও ঠাট্টায় বিদ্রূপে হাসিতে উচ্ছল হয়ে। পুরুষগুলো দলছাড়া, একা একা।

তারপর খাদের মুখে হাজিরা-ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায় ভিড় করে।

জানালার ওপাশে মোটা খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে হাজিরা নেয় টোকেন-বাবু।

ওদিক থেকে প্রশ্ন আসে, নাম?

—আকুম মুণ্ডা!

—নম্বর?

—নব্বই।

—মুন্‌শির নাম?

—গোপীচাঁদ।

খাতায় হাজিরা লিখে চোখ তুলে তাকায় টোকেনবাবু।

—তোর জরুটার কি হলো, আসছে না যে?

আকুম ভিড় ঠেলে বেরিয়ে যেতে গিয়ে থেমে দাঁড়ালো।

হেসে বললে, উ ছুটি লিয়েছে মুন্‌শির কাছে।

—কেন?

আকুম লজ্জায় মাথা নীচু করে কি যেন বলবার চেষ্টা করলো। আশেপাশের মেয়েপুরুষগুলো তা দেখে হেসে উঠলো সশব্দে।

কে একজন বললে, রাঙ্‌নার বেটা হঁয়েছে গো হাজরেবাবু।

সঙ্গে সঙ্গে আর এক দমকা হেসে উঠলো সকল।

লাজুক হাসি হেসে ভিড়ের মধ্যে থেকে সরে পড়লো আকুম, তরতর করে নেমে গেলো খাদের গভীরে। সঙ্গীসাথীদের রসিকতা মনে পড়তেই মুখে কৌতুকের হাসি দেখা দিলো তার। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো কেউ লক্ষ্য করছে কিনা। তারপর গাঁইতিটা হাতে নিয়ে জুড়ী খুঁজলো।

ছুটি নিয়েছে রাঙিনা। তার বদলে আকুমের জুড়ী হয়েছে মোংলা। ধাওড়ার প্রতিবেশী নয়, থাকে সে বাবুদের কোয়ার্টারের পিছনে। দু-চার ঘর বাবুদের বাসায় বাসন মাজে অবসর সময়ে, দুপুর পাল্লায় কাজ করে খাদে।

কাজ আর কি। গাঁইতির পর গাঁইতি পরে কয়লার স্তরে, ঝুড়ি বোঝায় করে সেগুলো দিতে হয় ট্রলী লাইনের বাকেটে।

কিন্তু আকুমের দু-দিনেই কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে মেয়েটার উপর।

জুড়ীকে খুঁজতে খুঁজতে আকুম হঠাৎ দেখলে হেলেদুলে নেমে আসছে মোংলা। হাতে কাপড়ে বাঁধা ভাতের থালা।

মোংলা কাছে আসতেই আকুম থালাটা দেখিয়ে বললে, উটা কি বটে?

—ভাত আনেছি তুয়ার তরে। হাসলো মোংলা।

আকুম চমকে উঠলো যেন।

মোংলা তাকালো আকুমের মুখের দিকে। কি যেন খুঁজলো তার চোখের দৃষ্টিতে, তারপর ধীরে ধীরে বললে, দুফারে চিঁড়া খায়ে শরীরটা টিকবে নাই তুয়ার।

রাঙিনা পড়ে আছে ডেরায়। তাই দুপুরে ভাতের বদলে

চিঁড়ে খেয়ে পেট ভরায় আকুম। যাকে সারাদিন গাঁইতি চালাতে হয় চিঁড়ে খেয়ে কি শরীর থাকবে তার!

ভাতের থালাটা কালো দেওয়ালের একটা খাঁজে তুলে রাখলো মোংলা। ঝুড়িটা তুলে নিয়ে কাজ শুরু করলো।

আশেপাশে আরো অনেকে কাজ করছে, কারও দৃষ্টি নেই কোনোদিকে। কিন্তু কান সজাগ।

সুযোগ পেলেই ঠাট্টা করতে ছাড়ে না।

মোংলার কথাটাও কানে গেছে তাদের। কে একজন ঠাট্টা করে বললে, দরদটা ভালো লয় মোংলা।

ক্রোধের দৃষ্টিতে ফিরে তাকালো মোংলা।

তবু ঠাট্টা থামলো না।—বেটা কোলে লিয়ে ধাওড়ায় বসে আছে রাঙ্না, উয়ার মানুষটারে ছিনায় লিস না এখুন।

সবাই হেসে উঠলো, কিন্তু আকুম হাসতে পারলো না।

ওর মনের মধ্যে সুর গুনগুন করতে শুরু করেছে তখন। এতদিন মোংলা মেয়েটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে নি সে। কোনোদিন বুঝতেও পারে নি, মেয়েটার মনে তার জন্যে এতখানি দরদ লুকিয়ে আছে।

তবু তুর্নামের শেষ নেই মোংলার। বাবুরা বলে খাদের রানী ও, কুলিকামিনরা বলে ডাইনী। রানীই হোক্ ডাইনীই হোক্ আর সকলের থেকে পৃথক নিশ্চয়ই। তেমনি কালিঝুলি মাখা নোংরা কাপড় পরে ঝুড়ি মাথায় কাজ করতে আসে বটে, কিন্তু খাদের বাইরে গেলেই অন্য মানুষ। এমন ছিমছাম শৌখীন আর কেউ নেই। এতো খুঁতখুঁতে যে ধাওড়ায় থাকতে চায় না। শুয়োরের পাল আর পচা ভাতের তুর্গন্ধে নাকি মানুষ থাকতে পারে না।

ছুটির ঘন্টি বাজাতেই সাত নম্বর প্লটে যেখানে জল ঝরছে পাথর চুঁয়ে চুঁয়ে, জল ঝরে ঝরে একটা ছোটো ডোবার মতো হয়েছে, সেখানে ভালো করে স্নান করে আসে মোংলা। আকুমকে বললে,

নজর দিবি না ইদিক পানে। বৌয়ের গতরটা তো দেখেছিস, ই শরীরটা কি মিঠা আছে?

আকুম লজ্জিত হাসি হেসে অন্য দিকে তাকালো। আর সেই ফাঁকে খাদের ঝরনায় স্নান করে নিলো মোংলা। তারপর ভিজে কাপড়েই উঠে এলো টিপলারের কাছে, আকুমের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে।

টোকেনবাবুর ঘরে কাপড় রাখা আছে তার। রঙিন শাড়িখানা জড়িয়ে নিলো গায়ে, হাতে পরলো জলচুড়ি, কানে ঝিকাচিল্লি, গলায় পুঁতির মালা।

দেখতে দেখতে চেহারা বদলে গেলো যেন মোংলার।

ভিজে কাপড়টার এক প্রান্ত আকুমের হাতে ধরিয়ে দিয়ে অন্য প্রান্ত নিজে ধরলো, তারপর দূরের দূরে চললো কাপড়টা শুকোতে শুকোতে।

আর সেই ফাঁকে গল্প জুড়ে দিলো আকুমের সঙ্গে।

আকুমের মনেও কেমন এক মোহ দেখা দিলো। খাদের কুলি-কামিনরা মোংলাকে ঠাট্টা করে ডাইনী বলে। শুনে রেগে যায় মোংলা। রেগে যাবারই কথা। ধাওড়ার লোকগুলোকে বিশ্বাস নেই। ঠাট্টা করতে করতে হঠাৎ যদি সত্যিই ডাইনী বলে ভেবে নেয়, তা হলে আর নিস্তার নেই।

কিন্তু আকুমের মনে হলো বাবুদের দেওয়া নামটা ঠাট্টা নয়। সত্যিই খাদানের রানী মোংলা। পোশাকে-আশাকে মনেই হয় না কুলিকামিনদেরই একজন।

মোংলা নিজেও যেন তাদের থেকে দূরে দূরে থাকতে চায়। তাই বাবুদের বাংলায় কাজ করে, থাকেও সেখানে।

উঁচুনীচু অসমতল পথ ধরে দু-জনে হেঁটে চলে কাপড়টা মেলে ধরে। রোদ তখন পড়ে এসেছে, পুবের আকাশ থেকে ধীরে ধীরে অন্ধকার নামছে।

মোংলা হঠাৎ চোখে কৌতুক নাচিয়ে বললে, চল ক্যানে আমার ডেরায়, টুকুন মাণ্ডি খায়ে যাবি।

মোহগ্রস্ত চোখে মোংলার মুখের দিকে, মোংলার উচ্ছল শরীরের দিকে তাকালো আকুম।

মোংলা রহস্যের হাসি হেসে বললে, বাবুদের বাংলুটার পিছনে ডেরা আমার, উ ধাওড়ার পানা লয়।

বলে মুগ্ধ চোখ মেলে আকুমের স্বাস্থ্যে ভরা শরীরের দিকে, চওড়া বুকটার দিকে তাকালো মোংলা।

আকুম কি যেন ভাবলো কিছুক্ষণ। হয়তো রাঙিনার কথা। তারপর ঘাড় নেড়ে সায় দিলো, চ, যাবো না ক্যানে, নেশাটা মিলে তো যাবো না ক্যানে।

দুজনেই খুশিতে হেসে উঠলো। তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে চললো দুজনে। আর মোংলা কাপড়টা শুকিয়েছে কিনা পরখ করতে করতে একটু একটু কবে সেটা গুটিয়ে নিতে নিতে কখন একেবারে আকুমের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তা যেন আকুমও টের পায় নি।

জেনারেটর ঘরের বাঁক নিতেই সামনে পড়ে গেলো মুন্‌শি গোপীচাঁদ।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো সে। একবার মোংলার মুখের দিকে একবার আকুমের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, আরে এ মোংলা!

সোহাগের ভঙ্গিতে ঢলে পড়ে এক মুখ হেসে গোপীচাঁদের গায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো মোংলা।—মুন্‌শি বটিস? বলে গোপীচাঁদের মুখের দিকে কৌতুকের চোখে তাকিয়ে বললে হুকুমটা করে দে।

গোপীচাঁদ কি বললো আকুম শুনতে পেলো না। বুঝতে পারলো না।

শুধু দেখলো মোংলা বেঁকে দাঁড়িয়ে বলছে, আও, দিন সোকাল

তুদের হুকুম মানবো নাই। খাদানের ছুটি হয়ে গেছে ছুটি দিবি নাই আমাদের?

গোপীচাঁদ আবার কি যেন বললো।

মাথা নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো মোংলা, তাকালো একবার আকুমের মুখের দিকে।

তারপর, হঠাৎ খিলখিল করে হেসে আকুমকে বললো, ঘরে তুয়ার বৌ-টো খাদান পানে তাকায় আছে, ফিরা যা তুই, ফিরা যা। বাংলুতে কাজ আছে বটে আমার।

বলে আবার রহস্যের হাসি হেসে গোপীচাঁদের সঙ্গে দ্রুত পায়ে অন্য পথ ধরে চলে গেলো মোংলা।

কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো আকুম আবছা অন্ধকারটার দিকে তাকিয়ে। আঁকাবাঁকা পথটা বনঝোপের ভিতর দিকে যেখানে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়েছে, যেখান দিয়ে গোপীচাঁদ আর মোংলা অদৃশ্য হয়ে গেলো সেদিকে তাকিয়ে।

তারপর হঠাৎ রাগে থুতু ফেলে ধাওড়ার পথ ধরলো সে।

এতোয়ারীর হাটে দেখা হয়ে গেলো।

মোংলার ওপর, গোপীচাঁদের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে এসেছিলো আকুম। তার মনে নতুন এক মোহ সৃষ্টি করে সরে গিয়েছিলো মোংলা। একদিনে রাঙিনা, অন্যদিকে মোংলা। কল্পনার চোখে দু-জনকে তুলনা করে রাঙিনাকে যেন অনেক নিষ্প্রভ মনে হয়।

মোংলা হলো খাদানের রানী। বাবুরা, মুন্‌শি গোপীচাঁদ, সকলেই তার সঙ্গে দু-দণ্ড রয়েবসে কথা বলে। গা ঘেঁসে দাঁড়ায়। কেন দাঁড়াবে না। এমন সৌখিন কামিন তো আর একজনও নেই। সব সময়ে ছিমছাম, নতুন নতুন শাড়িতে গয়নায়, ঝকঝকে দাঁতের হাসিতে ফুর্তির ঝরনার মতো সদাসর্বদাই যেন বয়ে চলেছে। যেমন সারা শরীর তার চঞ্চল, তেমনি চোখ দুটো। হাতে কাচের চুড়ি নানা রঙের, তার ফাঁকে ফাঁকে দু-গাছা রুপোর। কানে রুপোর ঝিকাচিল্লি, পায়ে রুপোর চুট্‌কি।

হাটের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো মোংলা। এ-দোকান থেকে ও-দোকান। পরিচিত লোকজনের সঙ্গে ঠাট্টা হাসি। কেনাবেচার ফাঁকে পুরুষগুলো সবাই এক একবার নির্লজ্জ চোখে তাকিয়ে দেখছিলো মোংলাকে।

দুটো মুর্গী বেচতে নিয়ে এসেছিলো আকুম। বসেছিলো টিপলারের দিকটায়। হঠাৎ দেখলো এক ঝুড়ি বিলাইতি নিয়ে সুখন আর সোমরী বসবার জায়গা খুঁজছে।

চিৎকার করে ডাক দিলো সে।—এ সুখন!

আকুমকে দেখতে পেয়েই খুশিতে উছলে উঠলো সোমরী।

পাশেই জায়গা করে নিয়ে বসে পড়লো।

দীর্ঘকাল পরে দেখা সাক্ষাৎ। গ্রামের খবর, গাসি মুণ্ডার

খবর, নতুন নতুন ঠিগিয়া আর বাপলার খবরে তুপুর কেটে গেলো।

সোমরী ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলে, বেটাবেটি আসে নাই তুয়ার ওড়াকে? রাঙ্‌না কুথায় আছে বটে?

হাসলো আকুম। জানাবার মতো খবরটা জানালো।

সোমরী লজ্জার হাসি হেসে বললে, তো আমার বেটাটার সাথে তুর বেটিটার বাপলা হবেক।

আর সেই মুহূর্তেই মোংলা চরকির মতো ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হলো। হেসে বললে, তোরে ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে তো পা তুটায় দরদ লাগে গেছে।

বলেই আকুমের সামনে বসে পড়লো মোংলা।

পাশের ঝুড়ি থেকে একটা বিলাইতি তুলে নিয়ে চুষতে চুষতে বললে, রাগে গেলি?

কেন রাগবে না সোমরী! বেচতে এসেছে সে, বিলিয়ে দিতে তো আসে নি। কিন্তু তার চেয়ে বেশি রাগ হলো মোংলার দিকে তাকিয়ে। রাগ না ঈর্ষা?

কোমড় থেকে একটা সুতলির থলী বের করে একটা পয়সা ছুঁড়ে দিলো মোংলা। আরো তুটো বিলাইতি তুলে নিয়ে বললে, দামড়ির গরম দেখাস ক্যানে। খাদানের কামিন বটি আমরা, দামড়ি আমারদের মা বাপ লয়।

বলে সোমরীর দিকে পিছন ফিরে টমাটো চুষতে চুষতে আকুমের সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয় সে।

এদিকে একটার পর একটা খদ্দের আসে, আকুমের মুর্গী তুটো দরদস্তুর করে, চলে যায়।

মোংলা হাসে আড় চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে। ও বেশ বুঝতে পারে লোকগুলো আসলে তার টানেই আসছে। মুর্গী কেনবার জন্যে নয়।

আকুম এক একবার কম দামেই মুর্গী দুটো ছেড়ে দিতে যায়, বাধা দেয় মোংলা।—সিমসিমারি বিকায় দিতে সুময় লাগে? বিকায় দিবি তো সারা বিকালটা হাটে বসে থাকবি?

ওদিকে বিলাইতির ঝুড়ি শেষ হয়ে আসে সোমরীর। হিসাব-নিকাশ তো ভালো বোঝে না, যে যা দেয় তাই নেড়েচেড়ে দেখে আকুমকে জিজ্ঞেস করে ঠিক দিয়েছে কিনা, তারপর কোমড়ে গুঁজে রাখে।

মোংলার গল্প শুনতে শুনতে মুর্গী দুটো বিক্রী করার কথা ভুলেই গিয়েছিলো আকুম।

হঠাৎ মোংলা চিৎকার করে ডাকলো কাকে।

আকুম ফিরে তাকিয়ে দেখলে ম্যানেজার সাহেবের বাবুর্চিটা আসছে সেদিকে।

মোংলা মুর্গী দুটো তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, আমার বটে, সাহেবের লেগে লিয়ে যা।

দরদস্তুর শুরু হলো। ডবল দাম দিয়ে সে-দুটো কিনে দিয়ে নিয়ে গেলো বাবুর্চিটা।

ফ্যালফ্যাল করে মোংলার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সশব্দে হেসে উঠলো আকুম। হঠাৎ মনে হলো তার, রাঙিনা এভাবে মাল বেচতে পারে না হাটে। মোংলা সত্যিই খাদানের রানী।

এদিকে বিলাইতি শেষ হয়ে গেছে সুখন আর সোমরীর। পয়সাগুলো ভালো করে বেঁধে রাখলো সুখন তার কোমড়ে। চালের দরদাম জিজ্ঞেস করলো, তারপর দূর থেকে ইশারায় ডাকলো আকুমকে।

বললে, হাটে আসছি ই কথাটো বলবি না কারেও।

—ক্যানে?

সুখন হাসলো। হাটে মাল বেচা পাপ বটে। গাসি মুণ্ডা রাগে যাবে, পঞ্চায়েত রাগে যাবে।

সোমরীও মুখ নীচু করে বললে, প্যাটে ক্ষিদাটা আছে, বেটা হয়েছে, বেটার ক্ষিদাটা আছে, পঞ্চায়েত খালি পাপ দেখে।

আকুম হেসে বললে, উ লাপরা জ্বলে যাবেক। তুরা খাদানে চলে আয়।

সোমরী উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলো, কাম দিবি?

আকুম ঘাড় নেড়ে বললে, হুঁ দিবো নাই ক্যানে।

দিবো নাই ক্যানে। যেন খাদে কাজ দেবার মালিক সে। কিন্তু গ্রাম থেকে পালিয়ে এসেছে সে, সে-গ্রামের লোকদের কাছে নিজের অবস্থাটা একটু রঙ চড়িয়ে না বললে সুখ কোথায়।

আর সে-ছবি চোখের সামনে দেখতে দেখতে ফিরে গেলো সোমরী। সত্যই বুঝি খাদের কাজে অনেক সুখ। তা না হলে···

মোংলার কথা ভেবে সোমরীর মনে হলো সেও বুঝি অমনি রঙিন শাড়ি পরে, রুপোর গহনা পরে ঘুরে বেড়াতে পাবে হাটের মধ্যে। অমনি চেহারার জলুস খুলবে তারও, সুখনটা বিলাইতী বেচতে বেচতে যেমন হাঁ করে তাকিয়ে ছিলো মোংলার দিকে তেমনি তার দিকেও তাকিয়ে থাকবে।

মনের মধ্যে একটাই লোভ। খাদের কাজ, নগদ মজুরী। দামড়ি পাবে মুন্‌শির কাছে, অনেক দামড়ি। তা দিয়ে যা খুশি কিনতে পারবে হাটে থেকে। রঙিন কাপড়, কাচের চুড়ি, রুপোর গহনা।

দিনের পর দিন কেটে চলে। এতোয়ারীর হাটে আসে যায়, কখনো বিলাইতি, কখনো ধনিয়া নয়তো সিমসিমারী। পয়সা দিয়ে কিনে নিয়ে যায় চলে। লুকিয়ে লুকিয়েই যায়। গাসি মুণ্ডা না জানতে পারে, পানা মান্‌কি না জানতে পারে।

কিন্তু ঠিক এমন হবে কেউ ভাবতে পারে নি। না সুখন না সোমরী।

গাঁয়ের কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করেছে। উ ফলটা কি বটে রে সোমরী, ক্ষেতে উ রাঙা ফলটা লাগায়াছিস ক্যানে?

খিলখিল করে হেসে উঠেছে সোমরী।—উ বিলাইতি বটে, খালে শরীরের রঙটা রাঙা পানা হয়।

একে একে তা শুনে অনেকেই বীজ নিয়ে গেছে, নিজের নিজের ক্ষেতে চাষ করেছে। পানা মান্‌কিও নিয়ে গেছে বিলাইতির বীজ।

কিন্তু এমন হবে কোনোদিন কল্পনাও করে নি সোমরী।

এতোয়ারীর হাটে প্রতিদিনের মতোই এসে বসেছিলো সে। দেখছিলো মোংলাকে। হেলেদুলে হেসে নেচে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো মোংলা। দুনিয়াসুদ্ধ সব লোকগুলোই যেন তার চেনা। সকলের সঙ্গেই দু-চারটে কথা বলে, হাসিঠাট্টা করে। আর সোমরীর মনে রঙ বোলায়। মনে মনে ইচ্ছে হয় সোমরীর, ঠিক ঐ মোংলার মতো হতে। ইচ্ছে হয় যে লোকগুলো যেন তার দিকেও প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকায়, অমনি কথা বলে মিঠে মিঠে।

একদৃষ্টে ঐ দিকেই তাকিয়ে ছিলো সোমরী। লক্ষ্য করে নি।

পানা মানকিও লক্ষ্য করে নি প্রথমটা। গোটা কয়েক মুর্গী নিয়ে বসবার মতো জায়গা খুঁজছিলো পানা। আর ভালো করে না দেখে সোমরীর পাশেই এসে বসে পড়লো সে।

তারপর দু-জনেই তাকালো দু-জনের দিকে। চোখোচোখি হতেই ভয়ে বুক ধরাস করে উঠলো সোমরীর। আর পানা মানকিও চমকে উঠেই লজ্জা পেলো যেন। পরক্ষণেই এমন একটা ভাব করলো পানা যেন কিছুই হয় নি।

ধীরে ধীরে শুধু প্রশ্ন করলে, সুখনটা কুথায়?

—উ মোরগ লড়াই দেখছে হবে।

উসখুস করলো পানা। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ বললে, উ গাসিটা ধরম নিয়ে থাকুক ক্যানে। প্যাটের ক্ষিদাটা ধরম কথা শুনবে নাই।

সোমরীর তবু ভয় যায় না। মনে মনে ভাবে, সুখনটা ফিরে এলে যেন বাঁচে ও।

পানা মান্‌কি আবার বলে, খাদানটা পাপ হবে ক্যানে। মাটিটা মা বটে, মায়ের প্যাটে বেটাবেটি কি পাপ আছে? তবে মাটির প্যাটে খাদান আছে তো পাপ হবে ক্যানে।

সোমরী একটু একটু করে যেন সাহস পায়। বলে, তুরাই তো বলিস পাপ হবে। মান্‌কি মুণ্ডার কথাই তো ডর লাগায়।

পানা মান্‌কি হেসে বলে, উ সব পালায়ছে রে, সব পালায়ছে খাদানে। তুরা জানিস নাই, উ লোহারগুলান পালায়ছেঁ, তাঁতিটা পালায়ছে। উ গাসি মুণ্ডাও খাদানে পালায় যাবে।

শুনে বিস্ময়ে চোখ কপালে তোলে সোমরী। সত্যি, তাই কি লোহারগুলোর দেখা মেলে না, তাঁতিটার দেখা মেলে না?

সুখন ফিরে আসতেই সোমরী বললে, চ আকুমটারে ঢুঁড়ে লিয়ে আসি।

ক্যানে?

—খাদানে কাম করবো আমরা। উ মান্‌কি বুলছে ধাওড়ার মান্‌কি হবে উ, লাপরা ছাড়ে চলে আসবে।

বলে পানা মান্‌কির দিকে ইশারা করলে সোমরী, খিলখিল করে হেসে উঠে।

পানা মান্‌কিও হেসে উঠলো সুখনকে চমকে উঠতে দেখে।

তারপর তিনজনেই সশব্দে হেসে উঠলো।

লাপরার গাঁ দেহাত ভেঙ্গে ভেঙ্গে উঠে এলো খাদের ধাওড়ায়। আকুম আর রাঙিনা পালিয়ে এসেছিলো। লোহার আর তাঁতি পালিয়ে এলো। সুখন, সোমরী, পানা মান্‌কি সবাই পালিয়ে এলো।

খাদের কাজে অনেক সুখ। অনেক আনন্দ। নগদ মজুরী মিলবে সেখানে, ধাওড়ায় ঘর মিলবে।

কিন্তু গাসি মুণ্ডা যাবে না।

রোগে ভুগে ভুগে মারা গেলো গাসি মুণ্ডার বৌ লাপরি। খবর

শুনে ছুটে এলো আকুম আর রাঙিনা। কিন্তু না, তার বুড়ি বৌকে দেখতে দেবে না গাসি, ছুঁতে দেবে না।

পাগলের মতো হয়ে গেলো গাসি। বদ্ধ উন্মাদ যেন। টাঙি নিয়ে তাড়া করে এলো সে আকুম আর রাঙিনাকে। বিখিয়া আর অন্য অনেকে ধরে সামাল দিলো। আরেকটু হলেই বুঝি খুনোখুনি হয়ে যেতো।

মেয়েগুলো বোঝালো, খাদানের বাবুগুলার কানুন আছে। টাঙি দিয়ে কুপায় দিবি তো লট্‌কা হবেক, কালাপানি হবেক।

দুটো রক্তচক্ষুতে মেয়েগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে সশব্দে মাটিতে থুথু ফেললো গাসি।—লট্‌কা হবেক! তো হবেক।

বলে ঘাড়টা বাড়িয়ে দিলো, যেন এখনই ফাঁসী হয়ে যাক তার।

আকুম আর রাঙিনাকে সরিয়ে দিলো বিলিয়া। বললে, বুড়া ক্ষ্যাপে গেছে রে, তুরা পালায় যা।

রাঙিনাও যেন ভয় পেয়ে গেছে তার বাপকে। সত্যিই বুঝি পাগল হয়ে গেছে গাসি। ধীরে ধীরে খাদের দিকে পা বাড়ালো তারা।

গাসি মুণ্ডা তখনও কাঁধে টাঙি নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে।—সব কুপায় দিবো, পাপীগুলাকে কুপায় দিবো।

চিৎকার করে গাসি আর টাঙি আস্ফালন করে ঘুরে বেড়ায়।—আমার গাঁওদেহাত জ্বালায় দিছে খাদানের বাবুরা। বাবুদের কুপায় দিবো।

সমস্ত স্বপ্ন যেন ভেঙে গেছে গাসির। ধর্মের জন্যেই, পাপ করবে না বলেই সিল্লির গাঁ ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলো তারা। বন পুড়িয়ে নতুন গাঁ বসিয়েছে, চাষের ক্ষেত বানিয়েছে। কিন্তু মাল-গুজারির চেয়ে বড়ো পাপ এসে ঢুকেছে এখানে। খাদ! খাদের পাপ এসেছে এখানে, জ্বালিয়ে দিয়েছে গাসির লাপরাকে।

যে ক-জন তখনও গাঁ ছেড়ে পালায় নি তারাও ভয় পেয়ে গেলো।

মুণ্ডা হলো গাঁয়ের মাথা, পঞ্চায়েতের হুকুমদার সে-ই। অথচ সেই গাসি মুণ্ডাই কিনা পাগল হয়ে গেছে। কখন কি করে বসে ঠিক নেই।

ভয়ে ভয়ে সকলেই জল্পনা-কল্পনা করে খাদে পালিয়ে যাবার। গাসির ভয়ে, পঞ্চায়েতের ভয়ে খাদে যেতে পারে নি তারা। হ্যাঁ, ধর্মের ভয়ও ছিলো, পাপের ভয়। ভেবেছিলো পঞ্চায়েতের বিধান না মেনে খাদে গেলে পাপ হবে। কিন্তু কই, আকুম আর রাঙিনার তো পাপ লাগে নি।

গ্রাম ভেঙে গেলো। শহর গড়ে উঠলো। দেহাতী গাঁ থেকে একে একে প্রায় সকলেই উঠে এলো খনি-শহরে।

পাগলা গাসি মুণ্ডা টাঙি হাতে নিয়ে নেচেকুঁদে বেড়ায় বনে বনে, কখনওবা দিনরাত গুম হয়ে বসে থাকে সারনা তলায়। কেউ তার খবর রাখে না, কেউ আর ভয় পায় না।

যারা ধাওড়ায় ঘর পেলো তারা উঠে এলো গ্রাম ছেড়ে, বাকী সবাই রয়ে গেলো গ্রামেই। ভোরের ভোঁ বাজার এক প্রহর আগে থেকেই ছুটতে শুরু করে তারা—খাদের দিকে।

হাজরি বাবুকে বড়ো ভয় তাদের। দেরি হলেই আধা মজুরী কেটে দেবে।

সুখন আর সোমরী অবশ্য ঘর পেয়ে গেলো ধাওড়ায়। পানা মান্‌কিও।

কিন্তু ধাওড়ায় এসে তারা প্রথম বুঝতে পারলো তারা মুণ্ডা নয়। বাবুদের কাছে, সাহেবদের কাছে তারা সবাই সাঁওতাল। মুণ্ডা, আর ওঁরাও, জুয়াং আর ছত্রিশগড়ী সবাই সাঁওতাল।

পাশাপাশি থাকতে থাকতে তারা সবাই যেন এক জাত হয়ে গেছে। তাদের চোখে যেমন বাবুরা আর সাহেবেরা একজাত।

একজাত।

কথাটা আকুমের মনের মধ্যেও ঘুরপাক খায়।

ছিপছিপে চেহারার নতুন মুনশিটা প্রথম বলেছে তাদের এ-কথা। বলেছে, কুলিকামিনরা একজাত। বলেছে, দুটো জাত আছে দুনিয়ায়। যারা দামড়ি দেয়, আর যারা দামড়ির জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করে।

আরো অনেক কথা বলেছে নতুন মুনশিটা। বলেছে, তাদের

ঠকিয়েই নাকি বাবুদের বাংলো হয়, সাহেবদের পকেট ঝলমল করে।

কথাটা বিশ্বাস হয় নি কারও। আকুমও বিশ্বাস করে নি। কিন্তু তবু কেমন যেন উত্তেজনা বোধ করে সে।

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে খাদে নামছিলো আকুম।

হঠাৎ খিলখিল হাসি শুনে ফিরে তাকালো।

দেখলো এক কোণে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই হাসছে মোংলা।

কাঁধের গাঁইতিটা ফেলে দিয়ে মোংলার দিকে এগিয়ে গেলো আকুম।

—হাসছিস ক্যানে। রেগে গিয়ে প্রশ্ন করলো রূঢ় স্বরে।

—হাসছি তুয়ার ঢং দেখে।

আকুমও হেসে ফেললো। মেয়েটার খিলখিল হাসি, উচ্ছল রূপের দিকে তাকিয়ে না হেসে থাকা যায় না। কি এক আকর্ষণ আছে যেন মেয়েটার চটুল চোখে, শরীরের ছন্দে।

কিন্তু মোংলার হাবভাব, কথাবার্তা কেমন যেন। আর পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে মেলে না। বড় বেশি হাসে, বড় বেশি কথা বলে। আর মুনশি, ঠিকাদার, কম্পাসবাবু সবাই রসিকতা করে মোংলার সঙ্গে। সকলের সঙ্গেই যেন তার অন্তরঙ্গতা।

কিছু যে বোঝে না আকুম, তা নয়, সন্দেহ তারও আছে, আবার মোহও। মোংলাকে জুড়ী না পেলে গাঁইতি ওঠে না তার হাতের। মোংলা পাশে থাকলে কাজকে কাজ মনে হয় না তার।

মোংলা বললে, তোর জরুটা খাদানে আসবেক নাই ?

—না। লতুন জুড়ী মিলছে তো জরু কী হবে ? রসিকতা করে আকুম।

মোংলাও কম যায় না। বলে, জুড়ীটা শুধু খাদানে হবি, আর রাতের বেলায় কি হবে। বলেই সশব্দে হেসে ওঠে মোংলা।

এমনি করেই ঠাট্টা রসিকতার হাসি-হল্লার মধ্যে দিয়ে দিন কেটে চলে।

বাচ্চাকে কোলে নিয়ে রাঙিনা আবার কাজে এসে যোগ দেয়।

ভোরের ভোঁ বাজলেই রাঙিনা আর আকুম এসে দাঁড়ায় হাজরি বাবুর জাল-জানালায়। টোকেন নম্বর, মুনশির নাম জানিয়ে, চাকতি জমা রেখে খাদে নেমে যায় আকুম। আর রাঙিনা চলে যায় ওভারবার্ডেনের বালির পাহাড়ে। দুটো কাঠি পুঁতে একটা কাপড় টাঙিয়ে সূর্য আড়াল করে। তারপর চাটাই বিছিয়ে বাচ্চাকে শুইয়ে রেখে সেও নেমে যায় খাদানে।

সেদিনও এমনি নীচে নেমে চলেছিলো রাঙিনা। দেখলে ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে একটি ছোকরা বাবুও উঠে আসছে।

কুলিকামিন সবাই কাজ করতে করতে থমকে দাঁড়িয়ে সেলাম করছে।

তাদের দেখাদেখি রাঙিনাও সেলাম করলো। আর গল্প করতে করতে মুখ তুলে আবার তাকালো তার দিকে নতুন বাবু।

কুৎসিত চেহারার কামিনগুলোর মধ্যে এমন রূপ দেখেই বোধ হয় ফিরে তাকালো নতুন বাবু। তারপর যেমন এসেছিলো তেমনি চলে গেলো বাকেট-লাইনের ধার ঘেঁসে ঘেঁসে।

রাঙিনা তরতর করে নীচে নেমে এসে আকুমকে প্রশ্ন করলে, উ নতুন বাবুটা কে বটে?

—লাগর বটে! বলেই খিলখিল করে হেসে উঠলো মোংলা। আর কপট রাগে মোংলাকে তাড়া করে গেলো রাঙিনা।

মোংলা আর রাঙিনা— পরস্পরের সঙ্গে যতো না বন্ধুত্ব তার চেয়ে বেশি রেশারেশি। আকুমের সঙ্গে জুড়ী হওয়ার জন্যেই নয়, রাঙিনা লক্ষ্য করেছে, আকুম যেন তার চেয়ে মোংলার দিকেই আজকাল ঢলে বেশি। আগেকার মতো দুফেরি পাল্লা শেষ হতেই রাঙিনার সঙ্গে ধাওড়ায় ফিরতে চায় না আকুম।

প্রথম প্রথম রাঙিনা এ-সব লক্ষ্যই করে নি। কোলের বাচ্চাকে নিয়েই মুগ্ধ ছিলো সে। কিন্তু ক্রমশঃ চোখ খুললো রাঙিনার। মোংলা কাছে-পিঠে থাকলে তবেই মনটা খুশী থাকে আকুমের। মোংলা না থাকলে রাঙিনাকে জুড়ী নিয়ে এক মনে গাঁইতির পর গাঁইতি চালিয়ে যায় আকুম, কয়লার চাঙড় ভেঙে ভেঙে পড়ে, ঝুড়িতে বয়ে বয়ে বাকেটে তুলে দেয় রাঙিনা, কিন্তু হাসে না আকুম, কথা বলে না।

বেশ বুঝতে পারে রাঙিনা, মোংলা আকুমের চোখে রঙ লাগিয়েছে।

কিন্তু ঠিক এমন একটা দৃশ্য দেখতে পাবে সে, ভাবে নি রাঙিনা। সন্ধ্যে হয়ে আসছে তখন। শাল পলাশের গভীর বনের মাথায় রক্তলাল ফুলের প্লাবনের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে পশ্চিমের আকাশের লাল মেঘ। একটু একটু করে অন্ধকার নেমে আসছে পুবের আকাশ থেকে, লাল শাল পলাশ সে অন্ধকারে কালো হয়ে আসছে ক্রমশঃ। ধীরে ধীরে নিঃঝুম হয়ে আসছে সারা খাদ অঞ্চল। কর্মক্লান্ত কুলিকামিনের দল সারি বেঁধে চলেছে মারাংগাড়ার দিকে। স্নান সেরে দেহের মলিনতা দূর করে ধাওড়ায় ফিরে যেতে হবে।

খাদ থেকে একটা সরু পায়ে চলা পথ এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে ডাইনামো ঘরের পাশ দিয়ে।

খাদের মুখে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলো রাঙিনা, বাচ্চাকে কোলে নিয়ে।

আকুম হপ্তার রোজ নিয়ে গোপীচাঁদ মুনশির সুদ মিটিয়ে আসতে গেছে। ফিরে এলে দু-জনে এক সঙ্গে ধাওড়ায় ফিরবে।

অপেক্ষা করে করে শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়ালো রাঙিনা। সরু পায়ে চলা পথ বেয়ে এগিয়ে চললো ডাইনামো ঘরের পাশ দিয়ে।

গোপীচাঁদ মুনশির চোখের দৃষ্টিটা বুঝতে পেরেছে রাঙিনা। বুঝতে পেরেছে তার প্রতি মুনশির কেন এতো সদয় ব্যবহার। তাই

ভয় পেয়েছে রাঙিনা, এগিয়ে যেতে সাহস পায় নি। আকুমকে পাঠিয়েছে হপ্তার সুদ মিটিয়ে আসতে।

আবছা অন্ধকারে ডাইনামো ঘর পার হতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো রাঙিনা।

রাত্তিরে পাহাড়া দেবার জন্যে একটা গুমতি ঘর ডাইনামো ঘরের পাশেই। জলে কাদায় নোংরা হয়ে আছে সামনেটা।

সেদিকে তাকিয়ে প্রথমটা গা ছমছম করে উঠেছিলো রাঙিনার।

ডাইনী নয় তো?

না, ডাইনী নয়।

চিনতে পারলো রাঙিনা। মোংলা ফিসফিস করে কি বললো। তারপর ধীরে ধীরে জল কাদার পথ পার হয়ে বেরিয়ে এলো।

একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলো রাঙিনা। বাচ্চাটা কেঁদে উঠতেই তার মুখ চেপে ধরলো সে।

না, বাচ্চার কান্না শুনতে পায় নি মোংলা।

খিলখিল করে হেসে উঠলো সে। কি যেন বললো পিছনের লোকটিকে, তারপর বিস্রস্ত বাস ঠিক করতে করতে ফিরে দাঁড়ালো।

পিছনের লোকটিকে চিনতে অসুবিধে হলো না রাঙিনার।

আকুম!

সারা শরীর রাগে জ্বলে উঠলো তার।

দ্রুত পায়ে বনঝোপের রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে গেলো মোংলা। আর আকুম ধাওড়ার পথ ধরলো।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবছা অন্ধকারে গাছের গুঁড়িটার আড়াল থেকে দেখলো রাঙিনা। সারা শরীর তার জ্বলে উঠলো রাগে ঘৃণায়। কোলের ছেলেটাকে বুকে চেপে দাঁতে দাঁত ঘষে কি যেন বললো সে নিজের মনেই।

তারপর ধীরে ধীরে সেও ধাওড়ার পথ ধরলো।

ঠাণ্ডা বাতাস বইছে তখন। শন শন, শন শন শব্দ ভেসে আসছে ঝোপের দিক থেকে।

অন্ধকারে আঁকাবাঁকা সরু পথ চলতে চলতে হঠাৎ রাঙিনা আবিষ্কার করলো ধাওড়ার পথ ছেড়ে গোপীচাঁদ মুনশির ডেরার দিকে চলে এসেছে সে।

এ কি! চমকে উঠলো রাঙিনা।

এমন ভুল হলো কি করে তার? হলো কেন? নিজের মনেই হেসে ফেললো সে।

তারপর আবার মারাংগাড়ার পথ ধরে ধাওড়ার দিকে এগিয়ে চললো।

মাথার মধ্যে তখন একটা কথাই ঘুরপাক খাচ্ছে।

নতুন বাবুটার কথা।

নতুন বাবুটা বড়ো মিঠা মিঠা কথা বলে তাদের। বীরসা ভগবানই যেন নতুন বাবু হয়ে এসেছে আবার তাদের মধ্যে। বলে, খাদান বিষ লয়। খাদানটা নরক লয়।

খাদের কুলিকামিনগুলো দুর্বোধ্য চোখ তুলে তাকায় তার দিকে। বলে, নরক লয় ই খাদানটো? সাপ লয় ই খাদানের কুলিকামিনগুলা?

না। গাসি মুণ্ডার মতো খাদকে নরক বলে না নতুনবাবু, খাদে কাজ করাকে পাপ বলে না।

বলে, দেকোদের মা হলো মাটি। আর, ও'রাও মুণ্ডা সান্তালদের মা হলো এই খাদান। খাদে কাজ করে পেটভরে খেতে পায় তারা, খাদ নরক হবে কেন!

—তবে?

হাসে নতুনবাবু। বলে, ঐ মুনশি, ঠিকাদার আর বাবুরা—ঐ সাহেবরা নরক বানায়ছে এ খাদানকে।

শুধু তাই নয়, ওরাই নাকি পাপী বানিয়েছে মানুষগুলোকেও। গাঁওদেহাতের মানুষগুলোকে কাজ দিয়েছে বটে, কাজের জন্যে দামড়ি দেয় বটে, কিন্তু আবার দামড়ির লোভ দেখিয়ে তাদের ইজ্জতও নষ্ট করেছে। তাদের ধরম নষ্ট করেছে।

রাঙিনার কাছেও কথাটা নতুন লেগেছে। সকলের মতো সেও বিস্ময়ে গালে হাত দিয়ে বড়ো বড়ো চোখ করে শুনেছে সব কথা। কোনোটা বুঝেছে, কোনোটা বোঝে নি। কিন্তু একটা কথা মনে লেগেছে তার। ঐ মুনশি আর ঠিকাদার আর বাবুরাই পাপী বানিয়েছে সান্তালদের, ইজ্জত নষ্ট করেছে।

কাপড় আর গয়নার লোভ দেখিয়ে মোংলার মতো মেয়েদের নষ্ট করেছে মুনশিরা, আর মোংলারা নষ্ট করেছে আকুমদের। রাঙিনা যেন স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে।

ধাওড়ার মেয়েপুরুষ সব ধীরে ধীরে পাপের পথে এগিয়ে চলেছে।

বাপ তার ঠিকই বলেছিলো, গাসি মুণ্ডার কথাই ঠিক।

বাপকে ছেড়ে খাদে পালিয়ে আসার জন্যে অনুশোচনায় মন ভরে গেলো রাঙিনার। কিন্তু তাদের বাঁচাবার, তাদের আবার ধর্মের পথে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার মতো শক্তি কি কারও নেই?

হঠাৎ পানা মান্‌কির কথা মনে পড়ে গেলো রাঙিনার। গ্রাম ছেড়ে পানা মান্‌কিও এসেছে এই ধাওড়ায়। কুলিকামিনদের সুখ সুবিধে দেখার কাজ নিয়ে।

তার কাছেই যাবে সে। বলবে, তাদের ধর্মের পথে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। আকুমকে পাপের পথে নিয়ে গেছে মোংলা। একে একে সকলকেই নিয়ে যাবে।

কিন্তু তার আগে আকুমকে শিক্ষা দিতে হবে।

ধাওড়ার কুঠরীতে ফিরে কপাট বন্ধ করে শুয়ে পড়লো রাঙিনা। বাচ্চাকে বুকের কাছে নিয়ে।

না, আকুমকে ঘরে ঢুকতে দেবে না আজ।

রাঙিনা ভেবেছিলো কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে আকুম। দরজায় ধাক্কা দেবে। আর তা শুনেও শুনবে না রাঙিনা, উঠবে না চাটাই ছেড়ে!

কপাটের দিকে কান পেতে শুয়ে থাকতে থাকতে কোন ফাঁকে ঘুমিয়ে পড়েছিলো সে।

হঠাৎ শব্দ শুনে ধড়মড় করে উঠে পড়লো, অনেক রাত হয়েছে তখন। কাছেই কোথায় তুমদা মাদল বাজছে ডুম-ডুম ডুম-ডুম করে।

আকুমের চিৎকার শুনে উঠে পড়লো সে।

রাঙিনা জিজ্ঞেস করলে কে ঝামেলা বাধাচ্ছে এত রাত্রে। কপাট খুললো না।

আকুমের নেশায় জড়ানো উত্তর এলো, আগলটো খুলে দে রাঙিনা, আমি আকুম বটি।

আকুমের গলার স্বর শুনেই চটে গেলো রাঙিনা। চিৎকার করে বললে, না খুলবো নাই। তুয়ার মোংলার কাছে যা ক্যানে।

আকুমও নেশায় টলতে টলতে চিৎকার করতে শুরু করলো। আর হাতের লাঠিটা দমাদম পিটতে শুরু করলো দরজার ওপর।

ক্রমশঃ ভিড় জমে গেলো রাঙিনার ঘরের সামনে।

সোমরী আর সুখনও এসে দাঁড়ালো। চিৎকার করে কপাট খুলে দিতে বললে রাঙিনাকে। আর আকুমকে চুপ করতে বললে পানা মান্‌কি।

চিৎকার হট্টগোলে জেগে উঠলো পাড়ার লোক। সকলেই ছুটে এলো।

অনেকক্ষণ পরে দরজা খুলে দিলো রাঙিনা।

আর রাঙিনাকে দেখতে পেয়েই রাগের মাথায় হাতের লাঠিটা বসিয়ে দিলো আকুম রাঙিনার মাথায়।

লাঠির বাড়ি খেয়েই চিৎকার করে লুটিয়ে পড়লো রাঙিনা। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো।

যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো রাঙিনা। কুলিকামিনের দল ধরাধরি করে তাকে নিয়ে গেলো খাদের ডাক্তারখানায়।

পানা মান্‌কি বললে, ওঝা ডাকতে। সুখন সোমরী আরও অনেকের বিশ্বাস ওঝার ওপর। ডাক্তার ছুঁচ ফুটিয়ে শরীরে বিষ ঢুকিয়ে দেয়। ডাক্তারে ওষুধে বিষ আছে, মানুষ মরে যায়।

তাই লাপরার লোকগুলোর যতো বিশ্বাস ওঝার ওপর। বাধা দিতে চাইলো তারা।

কিন্তু ধাওড়ার কুলিকামিনরা তাদের মতো জঙ্গলের মানুষ নয়। ডাক্তারের হাতে রুগীকে সেরে উঠতে দেখেছে তারা। তাছাড়া শুধু রাঙিনাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্যেই নয়। আকুমের লাঠির ঘা পড়েছে রাঙিনার মাথায়। যদি মারা যায় মেয়েটা তা হলে খুনের দায়ে পড়বে তারা। তাদের ওপরও হামলা হবে।

ছুটো সাঁওতাল সর্দার এগিয়ে এলো। পিছনে পিছনে আরও অনেকে রাঙিনাকে ধরাধরি করে ডাক্তারখানায় পৌঁছে দিয়েই ম্যানেজার বাবুর বাংলোর দিকে চললো।

ম্যানেজার বাবুকে জানিয়ে রাখতে হবে খবরটা, থানাপুলিসকে জানিয়ে রাখতে হবে।

বাংলোর কাছে পৌঁছুতে হল্লা শুনে বেরিয়ে এলো ম্যানেজার সাহেব। আর সেই মুহূর্তেই অন্যদিক থেকে সাইকেল চালিয়ে এলো পাদ্রী সাহেব।

পাদ্রী সাহেবকে ভারি ভক্তি লাপরার কুলিকামিনদের। যারা খ্রীষ্টান নয় তারাও দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে তার কথা শুনতে ভালবাসে।

সাদা ধবধবে আলখাল্লা, তামাটে রঙের দাড়ি, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। সাহেবের মুখে হাসি যেন সব সময় লেগেই আছে। অমন ফরসা ধবধবে গায়ের রঙ পাদ্রী সাহেবের, অথচ কালো-

কুলো লোকগুলোর সঙ্গে মিতালী করতে পেলে যেন আর কিছু চায় না।

পাদ্রী সাহেবকে দেখতে পেয়ে ওরা যেন ভরসা পেলো মনে।

এগিয়ে এসে বললে ঘটনাটুকু। বললে, থানাপুলিস হামলা করবে বটে, তুরা বাঁচা রে সাহেব।

পাদ্রী হাসলো। পিঠে হাত দিয়ে, তাদের ভাষাতেই বললে, ডর কিসের বটে? যীশু আছেন উপরে, দেখছেন বটে দুনিয়ার মানুষকে।

লোকগুলো জানে যীশুর ভক্তি দেখালেই পাদ্রী সাহেব খুশী হয়। কিন্তু তার চেয়েও যে বেশি ভরসা পায় তারা পাদ্রী সাহেবের কথায়।

তাই বললে, উ যীশু বোঙা ভালো বটে, কিন্তু থানাপুলিসের হামলা হলে উ বাঁচাতে পারে না। তুই বাঁচা সাহেব।

ভরসা দিলো পাদ্রী।

একে একে সবাই চলে গেলো। পাদ্রী সাহেব বলেছে ভয় নেই, হামলা হবে না ধাওড়ার লোকদের ওপর।

ক্রমে ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেলো তারা। একদৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলো পাদ্রী সাহেব। কি যেন ভাবছে, কি যেন।

এই সরল বিশ্বাসী মানুষগুলোকে সত্যিই যেন ভালবেসে ফেলেছে পাদ্রীটা। আর তাকে ভালবেসেছে এই বুনো মানুষগুলো। তাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ ছলছল করে উঠলো পাদ্রীর, মুখে তৃপ্তির হাসি খেলে গেলো।

মাঝে মাঝে দু-চারজন কুলিকামিন তার ওপর চটে যায়, খাদের বাবুরা গালাগালি দেয় আড়ালে, তা জানে রেভারেণ্ড ম্যাথুস। তবু রাগ করে না সে। কার ওপর রাগ করবে? এরা যে অন্ধ, এরা যে আলো দেখতে পায় নি এখনও। ঈশ্বর যেন এদের ক্ষমা করেন।

না, বাবুরা যাই বলুক না কেন, কাউকে জোর করে খ্রীষ্টান করবার জন্যে আসে নি রেভারেণ্ড ম্যাথুস। টাকার লোভ দেখিয়ে বা পুলিসের ভয় দেখিয়ে মানুষের ধর্ম বদলানো যায় না।

মানুষ ধর্ম ত্যাগ করে, লোভে নয়, অতৃপ্তিতে। সাঁওতালদের খ্রীষ্টান করার ব্রত নিয়ে আসে নি ম্যাথুস, এসেছে সেবার ব্রত নিয়ে। এদের প্রতি বাবুদের অবহেলা দেখেছে সে, দেখেছে দারিদ্র্যে, রোগে, সামাজিক অনুশাসনে আর শিক্ষার অভাবে পশুর মতো বেঁচে আছে এরা। অথচ বাবু-বাংলোর একটা লোকও এগিয়ে আসে না এদের সাহায্য করতে।

কতটুকু সাহায্যই বা করে মাথুস! কতটুকু!

তবু সেইটুকু পেয়েই কৃতজ্ঞতার চোখে তাকিয়ে থাকে কুলি-কামিনের দল।

ভাবতে ভাবতে সাইকেলে উঠতে যাচ্ছিলো ম্যাথুস। হঠাৎ পিছন থেকে ডাক শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালো।

—পাদ্রী সাহেব!

ফিরে তাকিয়ে ম্যাথুস হেসে ফেললো। মোংলা না? মোংলা মেয়েটাকে বেশ লাগে ম্যাথুসের। এমন চটপটে, ছিমছাম চেহারার কামিন খুব কম আছে লাপরার খাদানে। মেয়েটা সাজগোজ করতে ভালবাসে বলে কেউ পছন্দ করে না তাকে, কিন্তু কই, ম্যাথুস তো কোনো দোষ খুঁজে পায় না।

ম্যাথুস মৃদু হেসে বললে, কি খবর বটে রে মোংলা?

মোংলা মাথা নীচু করে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করলো। যেন কি একটা বলতে চায়, বলতে লাজ লাগছে।

ম্যাথুস বললে, কি খবর, দাওয়াই লাগবে?

হ্যাঁ। সাইকেলের পিছনে একটা ওষুধের বাক্স বাঁধা আছে। রোগের চিকিৎসাও করে ম্যাথুস, আর সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের জন্যে একটা ইস্কুলও করেছে সে নিজের চেষ্টায়।

মারাংগাড়ার ধারে মাটির দু-খানা ঘর। পাতার ছাউনী, মাটির দেয়াল। তারই একটার চূড়ায় একটা কাঠের ক্রুশ আছে। সেটাই ম্যাথুসের গীর্জা। প্রতি রবিবারে সেখানে উপাসনা হয়। খ্রীষ্টান মেয়ে-পুরুষগুলোই নয়, অন্য অনেকেও এসে শোনে। বাইবেল থেকে দু-লাইন আউড়ে আধ ঘণ্টা ধরে ওদের ভাষাতে উপদেশ দেয় ম্যাথুস। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে বলেছেন যীশু, মদ খাওয়া কমাতে বলেছেন তাদের, জুয়া খেলা পাপ।

মানুষের সেবা করতে নেমেছে ম্যাথুস। এইসব অন্ধ অজ্ঞ মানুষের সেবা করতে চায়।

তাই একটা ইস্কুলও বসায় গীর্জার পাশে। ছোটো ছেলে-মেয়েগুলোকে উপদেশ দেয়। অক্ষর চেনাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ওদের কাছে ইস্কুল আর গীর্জার উপদেশের চেয়ে বড়ো লোভ দাওয়াই। খাদের ডাক্তারখানায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরনা দিয়েও ওষুধ মেলে না, কিন্তু পাদ্রী সাহেবকে খবর দিলে সে নিজেই বাইক ঠেলে ঠেলে ধাওড়ায় গিয়ে হাজির হয়। ওষুধ দেয় বিনা পয়সায়, বার বার নিজেই গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসে বাড়ি বাড়ি।

কুলিকামিনগুলো তার খোঁজ করে দাওয়াইয়ের জন্যে, ম্যাথুস জানে।

তাই প্রশ্ন করে, দাওয়াই লাগবে? কার বিমার বটে?

সহানুভূতির স্বর শুনে হাউ-হাউ করে কেঁদে ওঠে মোংলা, আছড়ে পড়ে পাদ্রী সাহেবের পায়ের কাছে।

বলে, আমারে তুই খ্রীষ্টান করে দেন পাদ্রী সাহেব, আমারে তুই খ্রীষ্টান করে দেন।

বিস্মিত হয় ম্যাথুস।

খ্রীষ্টান হতে চায় একটা সাঁওতাল মেয়ে।

আশ্চর্য। এখানে প্রথম এসে কত দিনের পর দিন এদের উপদেশ দিয়েছে, বুঝিয়েছে খ্রীষ্ট ধর্মের মাহাত্ম্য, কিন্তু তখন কেউ

কান দেয় নি তার কথায়, কেউ ধর্ম বদল করতে চায় নি। তারপর একদিন বড়ো সত্যটা ধরা পড়েছে ম্যাথুসের চোখে। ধর্ম চায় না এরা, চায় কল্যাণ। সেই কল্যাণ-পথই বেছে নিয়েছিলো ম্যাথুস।

তাই হঠাৎ মোংলা এমন ভাবে খ্রীষ্টান হতে চায় দেখে বিস্মিত না হয়ে পারে না ম্যাথুস।

ধীরে ধীরে তাকে তুলে ধরে বলে, কি হয়েছে তোর, কি হয়েছে বল ?

কাঁদতে কাঁদতে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলে মোংলা।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলে, ধাওড়ার কুলিকামিনরা নাকি তাকে বিটলা করবে বলেছে।

—বিটলা ? আতঙ্কে শিউরে ওঠে ম্যাথুস।

মোংলা কাঁদতে কাঁদতে বলে, হ্যাঁ সাহেব, বিটলা করবে।

কিন্তু কেন ?

কেন আর, পাপ করেছে সে আকুমের সঙ্গে, ঘর ভেঙে দিয়েছে রাঙিনার। তাই চটে গেছে ধাওড়ার লোকরা। খ্রীষ্টান করে নিলে তার ওপর কোনো হাত থাকবে না তাদের। তাই খ্রীষ্টান্ হতে চায় সে।

শুনে আঘাত পেলো ম্যাথুস। কি আশ্চর্য, ঈশ্বর আলোক দেন নি একে, স্বার্থের খাতিরেই ধর্মান্তর গ্রহণ করতে চায় সে।

তবু কি করে বাধা দেবে ম্যাথুস! বিটলার হাত থেকে কি মোংলাকে আর কোনো উপায়ে বাঁচাতে পারবে সে ?

না। ধাওড়ায় যাবে ম্যাথুস। বোঝাবে লোকগুলোকে। যদি না বোঝে তারা, যদি ক্ষমা করতে রাজী না হয়, তা হলে যীশু যাকে ডাক দিয়েছেন তাকে ফেরাবে কেন সে। ঈশ্বর তো সকলকে একই পথে আলো দেখান না। কেউ ভয়ে তাঁর কাছে ছুটে আসে, কেউ লোভে তাঁর শরণ নেয়। কেউ পরিত্রাণ চায়

পরম পরিত্রাতার পায়ে লুটিয়ে। বিটলার অত্যাচার থেকে বাঁচার আশায় যদি যীশুর আশ্রয় ভিক্ষা করে অশিক্ষিতা এক নারী, তাকে অন্যায় বলবে কেন ম্যাথুস।

তার গম্ভীর মুখখানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলো মোংলা। দেখলে ধীরে ধীরে প্রশান্ত হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ম্যাথুসের দুটি নীল চোখ।

ম্যাথুস বললে, ঘরকে যা মোংলা। বিটলার ভয় নাই তোর।

—ডর নাই।

—না।

বলে সাইকেল চালিয়ে ধাওড়ার পথ ধরলো ম্যাথুস।

এসে যখন পৌঁছলো, তখন সমস্ত ধাওড়াটা পুলিসে ঘেরাও করে ফেলেছে। ম্যানেজারের তার পেয়েই থানা থেকে ছুটে এসেছে পুলিসের দল।

খুনী আসামীটাকে ধরে নিয়ে যেতে হবে। তার বৌ রাঙিনা বাঁচবে না, খাদের ডাক্তার নাকি বলেছে সে কথা।

ধাওড়ার সামনে সাইকেল থেকে নামতেই ম্যাথুস দেখলে আকুমকে হাতকড়া পরাবার চেষ্টা করছে একটা পুলিস, তার কোলের বাচ্চাটাকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে কয়েকজন। আর প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে আকুম।

হঠাৎ পাদ্রী সাহেবকে দেখতে পেয়েই থেমে পড়লো আকুম।

তারপর ছুটে এসে বাচ্চাটাকে ম্যাথুসের সামনে ফেলে দিয়ে বললে, ই বাচ্চাটাকে তু পালবি রে ভালা সাহেব, অর মা'টারে খুন করেছি, তু বাচ্চাটারে পালবি।

বলেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো।

ম্যাথুসের চোখ বেয়েও জল ঝরে পড়লো।

ধীরে ধীরে বাইকটা গাছের গুঁড়িতে ঠেসিয়ে রেখে কালোকুলো বাচ্চাটাকে তুলে নিলো ম্যাথুস।

আর সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ খলখল করে আনন্দে হেসে উঠলো আকুম। খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলো তার মুখ।

ম্যাথুসের কোলে বাচ্চাটাকে দেখতে দেখতে হঠাৎ পুলিস-গুলোর দিকে ছুটে গেলো আকুম।

দু-হাত বাড়িয়ে বললে, লে, চ বাঁধে নিয়ে চ। আর ডর নাই আমার, ভালা সাহেব লিয়েছে বেটিরে, পাদ্রী সাহেব পালবে কয়েছে।

রাঙিনা বেঁচে যাবে কেউ ভাবতেও পারে নি। বেঁচেই গেলো সে, বেশ ভুগে ভুগে। মাথায় চোট লেগেছিলো যেখানটায়, মাঝে মাঝে অসহ্য যন্ত্রণা হয়।

তাই খাদের ডাক্তার বলে দিলো, ভার বওয়ার কাজ আর করতে পারবে না সে।

হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে ধাওড়ায় ফিরে এলো রাঙিনা। এসে দেখলো তার সেই কুঠরীটায় অন্য কুলি এসেছে। মুন্শির খাতা থেকে খারিজ হয়ে গেছে রাঙিনা আব আকুমের নাম।

বস্তিতে হল্লা বাধানোর জন্যে, রাঙিনাকে খুন করতে চেষ্টা করার জন্যে হাজত হয়ে গেছে আকুমের। বড়ো দারোগার আদালতে নাকি বিচার হবে তার।

আর তার ছেলে?

তাকে নিয়ে গেছে ম্যাথুস সাহেব, পাদ্রী সাহেব।

শুনেই পাদ্রী সাহেবেব মেটো গীর্জার দিকে ছুটলো রাঙিনা। মনে ভয় হলো ছেলেকে তার খ্রীষ্টান বানিয়ে দেয় নি তো!

এসে যখন পৌছলো রাঙিনা, দেখলো মাটির দেয়াল আর খড়ো চালের গীর্জাঘরের দেয়ালে ঠেসানো রয়েছে পাদ্রী সাহেবের বাইকটা। আর ভেতরে খ্রীষ্টান মেয়েপুরুষগুলো গলায় গলা মিলিয়ে গান গাইছে। যীশু বোঙার নাম গাইছে তারা।

গীর্জার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে থেমে পড়লো রাঙিনা। না, আজ রবিবার। পুজোর দিন খ্রীষ্টানদের।

সেইখানেই অপেক্ষা করলো রাঙিনা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গান বন্ধ হলো। এবার ম্যাথুস সাহেব নিজে কি যেন বলছে। কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পেলো না রাঙিনা, যেটুকু বা শুনলো বুঝতে পারলো না।

তারপর গীর্জার ভেতর থেকে বেরোতে শুরু করলো মেয়ে-পুরুষগুলো। কালো কালো চেহারার ওঁরাও, মুণ্ডা, সান্তাল, খড়িয়া সব গায়ে গা লাগিয়ে বেরিয়ে আসছে একে একে। সবাই ফরসা জামাকাপড় পরেছে, মেয়েগুলোর মাথায় ফিঁতে বাঁধা।

আশ্চর্য। এত যে মুণ্ডা আর ওঁরাওয়ে ঝগড়াবিবাদ, জুয়াং আর সান্তালে খুনোখুনি, সব এক হয়ে যেতে দেখেছে সে খাদের ধাওড়ায়। সেখানে সব এক, বাবুদের কাছে সব এক জাতের মানুষ। কিন্তু সেখানেও বুঝি এতখানি মিলে মিশে যায় নি পরস্পরে। ধাওড়ার মধ্যেও ওঁরাওদের পট্টি আলাদা, মুণ্ডাদের পট্টি আলাদা। শুধু খাদে কাজ করার সময় পাশাপাশি গাঁইতি ফেলে পুরুষগুলো, পায়ে পায়ে মাটি বয় মেয়েগুলো। আর ধাওড়ায় নিজের নিজের সমাজ গড়ে নিয়েছে তারা।

গীর্জার শান্ত আবহাওয়ার মাঝে সব জাত এক হয়ে গেছে। দেখে, বিস্মিত হলো রাঙিনা।

'মুণ্ডা আর সাঁতাল আর ওঁরাও সব মানুষগুলাই এক রে, সব মানুষগুলাই এক।' নিজের কথাটাই নতুন করে মনে পড়লো রাঙিনার।

হঠাৎ রাঙিনার মনে হলো, খ্রীষ্টান হওয়া মানুষগুলোকে অতো ঘৃণার চোখে দেখে ভুল করেছে সে। ঘৃণা করবার মতো মানুষ তো নয় ওরা।

—কে, রাঙিনা বটিস্ ?

ভিড় ঠেলে মোংলা এগিয়ে এলো হঠাৎ রাঙিনাকে দেখতে পেয়ে। বললে, চ, পাদ্রী সায়েব ঢুঁড়ছে তুয়ারে।

বলতে বলতেই ম্যাথুস বেরিয়ে এলো সকলের পিছনে পিছনে। সাদা আলখাল্লায় সর্বাঙ্গ ঢাকা, চোখে কালো ফিঁতেতে বাঁধা চশমা, মুখে অপরূপ একটা তৃপ্তির হাসি।

লোকটা বুঝি সত্যিই যীশু বোঙার সঙ্গে কথা বলে। এখনও বোধ হয় গানের রেশটা বাজছে পাদ্রী সাহেবের কানে।

মুগ্ধ চোখে কালোকুলো ছেলেমেয়েগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ মোংলার গলা শুনে ফিরে তাকালো ম্যাথুস।

—পাদ্রীবাবা! রাঙিনা গো, রাঙিনা ফিরে আসছে হাসপাতাল থিকে। বলেই উল্লাসে হেসে উঠলো মোংলা।

—আমার বেটার কি হলো পাদ্রীসাহেব? বলে আশঙ্কায় ভরা দুটো বড়ো বড়ো চোখ তুলে তাকালো রাঙিনা।

ম্যাথুস হাসলো। তারপর তাকালো মোংলার দিকে।

মোংলা হেসে বললে, উ আমার কাছে আছে রে রাঙিনা। পাদ্রীবাবা কইলো, মোংলা ছেলেটারে পালতে হবেক, তো পালছি। কিন্তুক, ঐ বেটারে আমি ফিরায় দিবো নাই।

রসিকতা মনে করে হাসলো রাঙিনা। কিন্তু মনে মনে অসন্তুষ্ট না হয়ে পারলো না। তার ছেলেকে মানুষ করছে মোংলা? এই মোংলার জন্যেই তো এমন অবস্থা তার। মোংলাই তার আকুমকে ছিনিয়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে। মোংলার জন্যেই আকুমের মাথায় রাগের বিষ ঢুকেছিলো। আর তার জন্যেই এমন অসহায় অবস্থা তার। কাজ করতে পাবে না খাদে। খেতে পাবে না, খাওয়াতে পারবে না তার বাচ্চাকে।

তবু মনের রাগ বুকে চেপে রাঙিনা মোংলা আর পাদ্রী সাহেবের পিছনে পিছনে চললো।

এসে দাঁড়ালো মারাংগাড়ার বাঁকটার ধারে।

দেখলো, নতুন একটা ঘর হয়েছে সেখানে। মাটির দেয়াল আর টিনের ছাদ দেওয়া খান কয়েক ঘর। তারই একটিতে থাকে ম্যাথুস সাহেব। আর অন্যগুলোয় বাচ্চা বাচ্চা একদল ছেলে মেয়ে।

চিৎকার হট্টগোলে মেতে ছিলো বাচ্চাগুলো।

ম্যাথুস সাহেবকে দেখতে পেয়ে তারা ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। একটাকে কাঁধে তুলে নিলো ম্যাথুস, হাসি মুখে আরেকটাকে বুকের কাছে চেপে ধরলো, ছু-তিন জন তার পা জড়িয়ে কোলে উঠতে চাইলো।

মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখলো রাঙিনা। আর সেই ফাঁকে মোংলা গিয়ে পাশের ঘর থেকে নিয়ে এলো রাঙিনার ছেলেটাকে।

ছেলেকে ফিরে পেয়ে খুশির ফুলঝুরি ফুটলো রাঙিনার চোখে। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো রাঙিনা। কিন্তু ছেলেটা যেন থাকতে চায় না রাঙিনার কোলে। মোংলার দিকে হাত বাড়ালো সে। তা দেখে সশব্দে হেসে উঠলো ম্যাথুস আর মোংলা।

কিন্তু ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন আশ মেটে না রাঙিনার। আর ম্যাথুসকে যতো দেখে ততোই যেন বিস্মিত হয়।

কোন সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে নাকি এসেছে পাদ্রী সাহেব। এসেছিলো যখন, তখন লোকটার পিছনে লেগেছিলো সবাই। রাঙিনা নিজেও দেখেছে, ধাওড়ার ছেলেগুলো পাদ্রী সাহেবকে বাইক চালিয়ে যেতে দেখলেই ঢিল ছুঁড়তো। পুরুষ-গুলো ঝগড়া বাধাতো তার সঙ্গে অকারণেই। সবারই রাগ ছিলো তার উপর। সব চেয়ে বেশি রাগ ছিলো বাবুদের। বলতো, তাদের ধর্ম ভুলিয়ে খ্রীষ্টান করবার জন্যেই নাকি এসেছে পাদ্রী সাহেব। টাকার লোভ দেখিয়ে খ্রীষ্টান করবার জন্যে।

তারপর দিনে দিনে লোকটার সত্যিকার পরিচয় পেলো কুলিকামিনরা। বুঝলো, মানুষটা অনেক বড়ো, মানুষটার শরীর মানুষের, কিন্তু মনটা দেওতার। লোকের উপকার করতে পেলে যেন আর কিছু চায় না। একে একে সবাই ভক্ত হয়ে পড়লো ম্যাথুস সাহেবের। বিপদে আপদে, অসুখে বিসুখে এই লোকটার কাছে ছুটে আসতে পেলেই যেন শান্তি।

যে ছেলেগুলো পিছন থেকে ঢিল ছুঁড়তো তাদের হাসিমুখে

যেদিন হাতছানি দিয়ে ডেকেছিলো ম্যাথুস, ভয়ে পালিয়েছিলো তারা। তারপর, একদিন ভয়ও কেটে গেলো। শুধু বড়ো বড়ো চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো তারা দূরে দাঁড়িয়ে। শেষে একদিন সকলেই আশ্চর্য হলো, দেখলো, পাদ্রী সাহেবকে দেখতে পেলেই ছেলেগুলো ছুটে আসে। থলির ভিতর থেকে মোয়া নয়তো মিঠাই বের করে বিলি করে ম্যাথুস, আর তা নেবার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।

কারও হয়তো বউ মারা গেছে, মেয়েটাকে মানুষ করবে বলে নিয়ে এসেছে ম্যাথুস। কারও বাপ মা দুই নেই, আশ্রয় পেয়েছে সে ম্যাথুসের কাছে। বিয়ে না হওয়া কোনো ডাইনী মা তার সদ্যজাত ছেলেকে ফেলে দিয়ে গেছে খাদের ধারে, তুলে এনেছে ম্যাথুস।

দেখতো সকলেই, জানতো সকলেই।

রাজার মতো ম্যাথুস সাহেব, রাজার ধরম তার। তাই সাহস করে কেউ আপত্তি জানাতে পারতো না। কিন্তু বাবুরা বলতো, পাদ্রী সাহেব নাকি বাচ্চাগুলোর ওপর যীশুর জল ছিটিয়ে দেয়, তাদের খ্রীষ্টান করে চালান করে দেয়।

কুলিকামিনরা অবশ্য বিশ্বাস করতো না বাবুদের কথা।

চোখের সামনে তারা দেখেছে পাদ্রী সাহেব মানুষ নয়, দেবতা। অসুখ হলে ধাওড়ার ওঝাকে পয়সা দিয়েও অসুখ সারে না, খাদের ডাক্তারখানায় ধরনা দিতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা, অথচ পাদ্রী সাহেব খবর পেলে নিজেই ছুটে আসে।

সেই ভরসাতেই ছেলেকে ফিরে পেয়েই রাঙিনা বললে, ডাক্তারটা কয়েছে খাদানে কাম দিবে নাই আমাকে, পেটের ক্ষিদাটারে কি কইবো রে পাদ্রীবাবা ?

শুধু নিজের পেটের ক্ষিদেটাই নয়, ছেলেকেই বা কি খাওয়াবে সে ?

শুনে হাসলো ম্যাথুস।

বললে, অমার ই ঘরটা আমার নয় রে বেটি, ই যীশু দেবতার ঘর বটে।

—তো?

মোংলা বুঝিয়ে দিলো ব্যাপারটা। এ ঘর ম্যাথুস সাহেবের একার নয়, সবারই ঘর এটা। এখানেই থাকতে পারে রাঙিনা, তার ছেলেও।

বিঘে কয়েক জমি আছে তার, গীর্জার মেয়ে পুরুষরা চাষ করে। আর খাদের ম্যানেজার, কয়েকজন ঠিকাদার মুন্‌শি কিছু কিছু টাকা দেয়। খ্রীষ্টান কুলিকামিনরা বিয়ের সময় দেয় আট আনা, এক টাকা, প্রতি রবিবারে দুটো করে পয়সা। তাতেই চলে যায়। এত ভাববার কি আছে রাঙিনার। ওঁরাওদের একটা জোয়ান পুরুষ, খাদের বাকেট চাপা পড়ে একটা পা কেটে গেছে; একটা বুড়ো সাঁওতাল, মাথাটা কি একটা রোগে সব সময়েই দুলছে তার কলের পুতুলের মতো; একটা পাগলী বুড়ি—এরা সবাই আশ্রয় পেয়েছে ম্যাথুস সাহেবের। রাঙিনাও পাবে।

হ্যাঁ, মোংলাব মতোই ছেলেমেয়েগুলোর দেখাশোনার ভার থাকবে রাঙিনার ওপর।

খুশি হলো রাঙিনা।

দিনকয়েকের মধ্যেই সেও মেতে উঠলো ম্যাথুস সাহেবের কাজে। খাদে কাজ করে পয়সা পেতো বটে, ইচ্ছে মতো জিনিস কিনতো বটে। কিন্তু এ কাজে যেন অনেক বেশি আনন্দ।

শুধু মাঝে মাঝে হঠাৎ এক এক সময় বড়ো উদাস হয়ে পড়ে রাঙিনা।

ম্যাথুস সাহেবের ঘর ছেড়ে, বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের হট্টগোল থেকে পালিয়ে এসে মারাংগাড়ার ধারে দাঁড়ায়। উদাস উৎকণ্ঠার দুটি চোখ মেলে তাকায় দূরের পাহাড়টার দিকে, যার গা বেয়ে মাথার ওপর দিয়ে দুলতে দুলতে চলছে রোপ-ওয়ের

বাকেটের সারি। খাদের টিপলার থেকে কয়লা বোঝাই হয়ে চলেছে দূরের রেল স্টেশনে।

সেই রেল স্টেশন থেকে আরো অনেক দূরের থানা-হাকিম ধরে নিয়ে গেছে আকুমকে।

মনে পড়তেই মোংলার ওপর সারা মন তার বিষিয়ে ওঠে।

হাজত হয়েছে আকুমের। কখন ছাড়া পাবে সে? ছাড়া পাবে কি না, কিছুই জানে না। জিজ্ঞেস করলেও কেউ বলতে পারে না।

শুধু ম্যাথুস সাহেব বলে, ফিরে আসবে আকুম, ফিরে আসবে।

সেদিনও এমনি উদাস চোখ মেলে তাকিয়ে ছিলো রাঙিনা।

হঠাৎ শিস দেওয়ার শব্দে তন্ময়তা ভেঙে গেলো তার। দেখলে, হাতে একটা কোদাল নিয়ে শিস দিতে দিতে আসছে ম্যাথুস।

—কুথাকে চলেছিস রে পাদ্রী বাবা? এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলে রাঙিনা।

কোথায় আর। কয়েকটা পেঁপের চারা বসাতে হবে, নিজেই কোদাল কাঁধে করে চলেছে ম্যাথুস।

রাঙিনার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলে যেতে গিয়ে থামলো ম্যাথুস।

বললে, একটা কাম আছে রাঙিনা বেটি।

—কি কাম, বল ক্যানে।

—গোপীচাঁদ মুনশির ই মাসের চাঁদাটা লিয়ে আসতে হবে।

—গোপীচাঁদ মুনশি? চাঁদা দেয় বটে উ?

হাসলো ম্যাথুস। হ্যাঁ, ওদের চাঁদাতেই তো চলে তার। টাকা না হলে তো মানুষের উপকার করা যায় না, সে টাকা দেয় ঐ ঠিকাদার আর মুনশিরা।

রাঙিনা বললে, উ আমি লিয়ে আসবো।

বলে গোপীচাঁদ মুনশির ডেরার দিকে পা বাড়ালো রাঙিনা।

কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থেমে পড়লো রাঙিনা। কুলি-

কামিনদের শান্তি কেড়ে নিয়েছে ঠিকাদার মুনশিরা, টাকা কর্জ দিয়ে সুদ আদায় করে গোপীচাঁদ মুনশি, রেহাই দেয় না কাউকে। কাউকে হাজতে দেয়, কারও বা ইজ্জত নষ্ট করে, সেই গোপীচাঁদ টাকা দেয় ম্যাথুস সাহেবকে? কুলিকামিনদের ভালো করতে চায় ম্যাথুস, তা জেনেও টাকা দেয় কেন গোপীচাঁদ?

ম্যানেজর সাহেবকে, ম্যাথুস সাহেবকে,—সাহেবগুলাকে বুঝা যায় না, মনের ভিতরে কি আছে উদের! কিন্তু দেকোরা আরও আজব মানুষ। এই ঠিকাদার আর মুনশিগুলো আরো রহস্যে ঘেরা।

তা হলে গোপীচাঁদ মুনশিটা লোক ভালোই। যে যাই বলুক। কুলিকামিনরা গালাগালি দিলে কি হবে। একবার হপ্তার সুদ দিতে পারে নি রাঙিনা, কই রাগে নি তো গোপীচাঁদ। বরং আরো পয়সা কর্জ দিয়েছিলো।

কাজ পেয়ে খুশি হলো রাঙিনা।

মারাংগাড়ার জলে হাত মুখ ধুয়ে দ্রুত পায়ে গোপীচাঁদ মুনশির ডেরার সামনে এসে যখন পৌঁছলো, তখন রোদ উঠেছে মাথার ওপর।

এ সময়টায় দুপুরের আহার সারতে আসে গোপীচাঁদ।

ভয়ে ভয়ে কাঠের ফটক খুলে ভেতরে ঢুকে গেলো রাঙিনা। আস্তে আস্তে ডাকলে, মুনশিজী!

ডাক দেবার সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ হলো, আর রাঙিনা ঘরে ঢুকে পড়তেই একটা কামিন মেয়ে ছুটে পালালো তার সামনে দিয়েই।

পরমুহূর্তেই গোপীচাঁদ সামনে এসে দাঁড়ালো।—আরে রাঙিনা, তু?

—হাঁ গো মুনশিজী! খাদের কাম থিকে আমার নামটা কাটে দিলি তো খাবো কি? উ পাদ্রীসাহেবের ডেরাতে লেগেছি, যীশু ভগবানের কাম করি তো পাদ্রীবাবা খেতে দেয়।

কথাটা শুনেই মুখের চেহারাটা বদলে গেলো মুনশির।

বললে, পাদ্রীসাহেবের ডেরায়? উ তো ধরম নষ্ট করে।

হাসলো রাঙিনা।—হুঁ, ধরম রাখবারে না জানিস তো ধরম নষ্ট হবে, কিন্তুক জীবনটা রাখে পাদ্রীসাহেব।

গোপীচাঁদ কিছু বললো না, চুপ করে রইলো।

রাঙিনা আবার হেসে বললে, কিন্তুক তুই তো মুনশিজী টাকা দিস, উ পাদ্রীসাহেবকে, ক্যানে, বল ক্যানে?

গোপীচাঁদ হো-হো করে হেসে উঠলো। বললে, উ সাওয়াল তো অন্য আছে। পাদ্রীসাহেবরে টাকা দিলে ম্যানেজার সাহেব খুশি হয়।

—হুঁ?

বিস্ময়ের চোখ তুলে গোপীচাঁদের মুখের দিকে তাকালো রাঙিনা। ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারলো না। পাদ্রীসাহেবকে টাকা দিলে ম্যানেজার সাহেব খুশি হবে কেন?

গোপীচাঁদ ধীরে ধীরে বললে, তুই আমার ডেরায় চলে আয় রাঙিনা। ইখানে আয়, ধরম রইবে ইখানে।

রাঙিনা কেমন যেন ভয় পেলো গোপীচাঁদের চোখের দৃষ্টিতে।

বললে, না রে মুনশিজী, না। আকুম ফিরে আসে তো রাগে যাবে, টাঙি দিয়ে কোপাই দিবে তোরে।

একটু থেমে বললে, পাদ্রী সাহেবের টাকাটা দে আমারে, আমায় পাঠাই দিলো পাদ্রী সাহেব।

—দিবো, দিবো। পাদ্রী সাহেবেরও টাকা দিবো, তোরেও টাকা দিবো। বলে দু-হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলো গোপীচাঁদ।

সমস্ত শরীরে যেন কামনার উন্মাদনা জেগে উঠেছে। গোপী-চাঁদের দুটি চোখ যেন উন্মত্ত আগ্রহে শিকার করা হরিণীর সর্বাঙ্গ লেহন করে পরিতৃপ্ত হতে চায়।

সবল দুটি হাতের আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলো সে রাঙিনাকে।

ছাড়া পাবার জন্যে ছটফট করলো রাঙিনা। কিন্তু গোপীচাঁদের দৃঢ় আলিঙ্গনের কাছে রাঙিনার সন্ত্রস্ত শরীর ধীরে ধীরে অবশ হয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পরে টাকাগুলো হাতের মুঠিতে ধরে ধীরে ধীরে পাদ্রী সাহেবের ডেরার দিকে পা বাড়ালো রাঙিনা।

থরথর করে সারা শরীর তার তখনও কাঁপছে।

আশ্চর্য। মনের গোপনে তার যেটুকু আক্রোশ ছিলো আকুমের বিরুদ্ধে, মোংলার বিরুদ্ধে, সব যেন মুহূর্তে মিলিয়ে গেলো।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েও এতখানি অসহায় বোধ করে নি সে। এই প্রথম যেন অসহায় বোধ করলো। মনে হলো, আকুম থাকলে বুঝি গোপীচাঁদ এমন ভাবে···

ডেরার সামনে আসতেই মোংলা ছুটে এলো, কি হইছে রে রাঙ্না, কাঁদিস ক্যানে ?

ঝরঝর করে সশব্দে কেঁদে ফেললো রাঙিনা।

কিছুক্ষণ পরে চোখ মুছে বললে, মুণ্ডা আর সাঁতাল, মুনশি আর ঠিকাদার ও বাবুরা আর সাহেবরা সব মানুষগুলাই এক রে মোংলা, সব মানুষগুলাই এক।

বুঝতে পারলো না মোংলা। প্রশ্ন করলে, কি হয়েছে।

একে একে সব কথা খুলে বললে রাঙিনা।

আর তা শুনে সশব্দে খিলখিল করে হেসে উঠলো মোংলা।

—হাসছিস বটে ? চটে গেলো রাঙিনা।

মোংলা হেসে বললে, চটিস ক্যানে। উ আমাদের পট্টির পাপ বটে, কিন্তুক খাদের ধরম বটে উ।

রাঙিনা রেগে গিয়ে বললে, পাদ্রী সাহেবরে কয়ে দিবো আমি।

—উঁহু। গম্ভীর হয়ে উঠলো মোংলা। বললে, পাদ্রী সাহেবরে —উ কথা কইবি না তু।

—ক্যানে?

মোংলা ধীরে ধীরে বললে, পাদ্রী সাহেবটা বড়ো ভালো রে াঙ্‌না, উ রাগে যাবে, মুনশিরে মারে ফেলবে ই কথা শুনলে। আর মারে দিলে লট্‌কা হয়ে যাবে পাদ্রী সাহেবের।

মাসখানেক পরেই খালাস হয়ে ফিরে এলো আকুম।

এ ক-মাস মনে মনে অনেক দুঃখ পেয়েছে, অনেক অনুশোচনা। অনুতপ্ত হৃদয়ে বার বার ভেবেছে, ছাড়া পেলেই রাঙিনার কাছে ফিরে গিয়ে ক্ষমা চাইবে, দোষ স্বীকার করবে। বলবে মদের নেশায় ভিতরের মানুষটা তার ঠিক ছিলো না।

তার জন্যেই তো গাঁওদেহাত ছেড়ে, পঞ্চায়েতকে ভয় না পেয়ে পালিয়ে এসেছিলো রাঙিনা। সেই রাঙিনাকে ভুলে সে কিনা ছুটেছিলো পাপের নেশায়, মোংলার নেশায়।

মোংলা নিশ্চয়ই একটা ডাইনী।

ডাইনের জন্যেই লোকে পাপ করতে বাধ্য হয়, বলতো রাঙিনার বুড়া বাপ গাসি মুণ্ডা। কথাটা মিথ্যে নয়। বাপ ছেলেতে ঝগড়া, ভাইয়ে ভাইয়ে কাজীয়া, স্বামী স্ত্রীতে ছাড়াছাড়ি, এ সবই ডাইন।

ধাওড়ায় ফিরে পানা মান্‌কিকে বলবে কথাটা, মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলো আকুম। মোংলা যে ডাইন সেটা বলতে হবে।

অনেক কিছু ভাবতে ভাবতেই খাদের পার দিয়ে এসে ধাওড়ায় পৌঁছলো আকুম। একেবারে নিজের ঘরখানার সামনে গিয়ে ধাক্কা দিলো।

—রাঙিনা, এ রাঙিনা। আগলটা খুল ক্যানে, দেখ ক্যানে কে বটে। বলে নিজেরই খুশির আমেজে হাসলো আকুম।

কপাট খুলে গেলো। কিন্তু—

প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিলো আকুম। রাঙিনা নয়, অন্য লোক। অচেনা লোক কে একজন। নতুন এসেছে হয়তো।

—রাঙিনা? লোকটা বিস্ময়ে চোখ কপালে তুললো। না, রাঙিনাকে চেনে না সে, আকুমকেও চেনে না।

দেখতে দেখতে লোক জমা হয়ে গেলো। ভিড় করে এলো সবাই।

—আকুম বটিস। খালাস মিলছে? পানা মান্‌কি এগিয়ে এলো চিনতে পেরে।

চেনা-জানা সবাই খুশি হয়েছে আকুমকে ফিরে আসতে দেখে। সোমরী আর সুখনও ছুটে এলো খবর পেয়ে।

সোমরীই খবর দিলো। তুদের নামটা খারিজ হয়ে গেলো মুনশির খাতা থেকে তো ঘর ভিন্‌ কুলিরে দিয়ে দিছে।

—আর রাঙিনা?

—উ মাথায় চোট লাগে হাসপাতালে গেলো, তো ফিরে আসে কাম দিলো নাই মুনশি।

আতঙ্কের চোখে তাকালো আকুম, কুথায় গেলো উ?

—পাদ্রী সাহেবের ওড়াকে আছে উ।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো আকুম। তারপর দ্রুত পায়ে ছুটলো পাদ্রী সাহেবের ঘরের দিকে।

খাদ পার হয়ে জেনারেটর ঘর পার হয়ে মারাংগাড়ার দিকে যেতে মাঝ-পথে দেখা হয়ে গেলো গোপীচাঁদ মুনশির সঙ্গে।

সেলাম করলো আকুম।

—আকুম? ছাড়া মিলছে?

—হা মুনশি।

গোপীচাঁদ হঠাৎ কি যেন ভাবলো, তারপর বললে, কাম করবি খাদানে?

—করবো নাই ক্যানে? কাম দিলে কাম করবো নাই? খাবো কি তবে?

গোপীচাঁদ হেসে বললে, তো আয়, নাম লিখাবি।

—উ পরে আসবো গো মুনশি। রাঙিনার খবরটা লিয়ে আসি।

বলে পা বাড়াতে গেলো আকুম।

গোপীচাঁদ হাত ধরে থামালো আকুমকে।

বললে, উ রাঙিনাকে ভুলে যা তু।

—ক্যানে ?

—উ খ্রীষ্টান হয়ে গেছে, উ পাপী হয়ে গেছে।

হো-হো করে হেসে উঠলো আকুম।—মিছা বলিস, রাঙিনা পাপী হবে ? মিছা বলিস।

গোপীচাঁদ আকুমের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললে, হুঁ রে, উ পাপী হয়ে গেছে। পাদ্রীসাহেবের সাথে পাপ করেছে উ।

তবু বিশ্বাস করলো না আকুম। রাঙিনা পাপ করবে, পাদ্রী সাহেব পাপ করবে ? মিছে কথা। তা হলে সুখন আর সোমরী বলতো না সে কথা ? পানা মান্‌কি বলতো না ? না, পাদ্রীসাহেবটা বড়ো ভালোমানুষ বটে। ও মানুষ লয়, দেওতা। আকুমের ছেলেটাকে কোলে তুলে নেয় নি পাদ্রীসাহেব ?

গোপীচাঁদের হাত ছাড়িয়ে দ্রুত পায়ে পাদ্রীর ডেরার দিকে ছুটলো আকুম।

এসে যখন পৌঁছলো, দেখলে একটা বাচ্চা ছেলেকে কোলে নিয়ে মোংলা দাঁড়িয়ে আছে।

আকুমকে দেখেই একমুখ হেসে এগিয়ে এলো মোংলা, ছেলেটাকে তুলে ধরে বললে, তুমার বেটা গো।

দু-হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে আকুম বললে, রাঙিনা কুথায়।

মোংলা ততক্ষণে ছুটে গেছে ঘরের ভেতর। একটু পরেই রাঙিনার হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে এলো।

হাসি ফুটে উঠলো রাঙিনার মুখেও।

আর তা দেখে ধীরে ধীরে সরে দাঁড়ালো মোংলা। দূর থেকে দেখলো সে, আনন্দে রাঙিনার দু-চোখ ভাসিয়ে জল নেমেছে।

মুগ্ধ আনন্দে একবার আকুমের মুখের দিকে, একবার আকুমের

কোলের শিশুটির দিকে তাকালো রাঙিনা। তারপর ধীরে ধীরে ছেলেকে নিজের কোলে তুলে নিলো।

আকুম আস্তে আস্তে বললে, ফিরা এলাম রাঙ্‌না, ফিরা এলাম।

—হুঁ। লজ্জাতুর চোখের দৃষ্টি আকুমের চোখে থেকে পিছলে নীচে নামলো। যেন কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছে না রাঙিনা। এতদিন অপেক্ষার পর, এত এত দুশ্চিন্তার শেষে আকুম ফিরে এসেছে। আর ভয় নেই তার, সবচেয়ে বড়ো ভরসা ফিরে পেয়েছে।

আকুম ধীরে ধীরে বললে, গোপীচাঁদ মুনশি কাম দিবে কয়েছে রাঙ্‌না, ফের কাম দিবে ও ধাওড়ায়। চ তু, মুনশির কাছকে চ, নাম লিখাবি।

—উহুঁ। বেঁকে দাঁড়ালো রাঙিনা।

চমকে উঠলো আকুম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো সে রাঙিনার মুখখানা। ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছে না।

আবার প্রশ্ন করলে, যাবি নাই তু? নাম লিখায়ে চাকতি নম্বর লিবি নাই মুনশির কাছে?

—না।

—ধাওড়ায় ফিরবি নাই তু?

—না।

বিস্ময়ের পর বিস্ময়। ক্রমে ক্রমে আকুমের মুখের চেহারা বদলে গেলো। কি আশ্চর্য, যা কল্পনাও করতে পারে নি সে, যা বিশ্বাস করে নি তা কি তবে সত্যি? গোপীচাঁদ তা হলে ঠিকই বলেছে। সত্যিই খ্রীষ্টান হয়েছে রাঙিনা, পাদ্রীসাহেব তার ধরম নষ্ট করেছে, ইজ্জত নষ্ট করেছে, তা না হলে ফিরতে চায় না কেন সে, ধাওড়ায় মুনশির কাছে গিয়ে চাকতি নম্বর নিতে চায় না কেন?

পেটে কি ক্ষিদে নেই রাঙিনার? কাজ নিতে হবে না? কাজ না পেলে খাবে কি?

হঠাৎ রেগে গেলো আকুম। রাঙিনার হাত ধরে একটা হেঁচকা টান দিলো। বললে, যাবি নাই ? যেতে হবে তুয়ারে।

আর সঙ্গে সঙ্গে রাঙিনাও রেগে গেলো। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, না যাবো নাই। যাবো নাই আমি।

ঝগড়া দেখে কাছে এগিয়ে এলো মোংলা। রাঙিনা কেন যে যেতে চায় না, কেন মুনশির কাজ নিতে চায় না তা জানে মোংলা।

মোংলা এগিয়ে এসে বললে, না যাবে নাই রাঙ্‌না মুনশির কাছে, পাদ্রী সাহেব যাতে দিবে নাই।

—পাদ্রী সাহেব যাতে দিবে নাই!

বলে দপ্‌দপ্‌ করে পা ফেলে ধাওড়ার পথ ধরলো আকুম।

সব বুঝতে পেরেছে আকুম। গোপীচাঁদ মুনশি যা বলেছে সব সত্যি। আর তার চেয়েও বড়ো সন্দেহটা মনে উঁকি দিয়ে গেছে তার, মোংলা ডাইন। ডাইনটার মন্ত্রে বশ হয়েই রাঙিনা পাদ্রী সাহেবের সঙ্গে পাপ করেছে, ধরম হারিয়েছে।

ডাইনটাকে তাড়াতে না পারলে ছারখার হয়ে যাবে খাদের সব কুলিকামিনগুলো। ডাইনটাকে নাগবন্দী না করতে পারলে রাঙিনাকে ফিরে পাবে না আকুম।

রাগে দপ্‌দপ্‌ করে পা ফেলে সটান ধাওড়ার ফিরে এলো আকুম। এসে দাঁড়ালো পানা মান্‌কির ডেরায়।

বললে, মোংলা একটো ডাইন বটে।

—ডাইন?

—হাঁ। মন্তর বলে উ রাঙ্‌নারে খ্রীষ্টান করে দিছে। পাদ্রী সাহেবের সাথে পাপ করায়েছে রাঙ্‌নারে। উ রাঙনা আর ফিরবে নাই বলছে।

পানা মান্‌কি শুনলো, শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। দেখতে দেখতে সুখন আর সোমরী ছুটে এলো। মুহূর্তের মধ্যে খবর রটে

গেলো চতুর্দিকে। সারা ধাওড়া ভেঙে পড়লো পানা মান্‌কির ডেরার সামনে।

ডাইন! ডাইন হয়েছে মোংলা!

ভয় আর আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠলো প্রত্যেকটি কুলিকামিনের মুখে। কি আশ্চর্য! ছেলে মেয়ে নিয়ে সুখে শান্তিতে বাস করছে তারা। সেখানে কিনা ডাইন হয়েছে মোংলা। ছেলেমেয়ের বুকের রক্ত শুষে নিচ্ছে দিনে দিনে।

সাজগোজ করে, রঙিন কাপড় রঙ বেরঙের জলচুড়ি, কানে ঝিকাচিল্লি পরে ঘুরে বেড়ায় মেয়েটা। এতোয়ারীর হাটে বাবুদের সঙ্গে ঠাট্টা রসিকতা করে। তাই সবারই রাগ ছিলো মোংলার ওপর। কিন্তু কেউ ভাবতেই পারে নি ভেতরে ভেতরে মন্ত্র পড়ে সিঙ্গাই হয়েছে মেয়েটা। ডাইন হয়েছে।

জটলা পাকিয়ে চিৎকার হট্টগোল তুললো কুলিকামিনের দল।

দেখতে দেখতে গুজব রটতে শুরু করে দিলো। কেউ বললে, অন্ধকার রাত্রে শনশন করে একটা গাছকে ছুটে যেতে দেখেছে। কেউ বললে, হাতে কুলো নিয়ে উলঙ্গ একটা মেয়েকে হাঁটতে দেখেছে অন্ধকারে। কেউ বললে, রাতের বেলায় তাকে ডেকে তুলেছিলো কে একজন, মন্ত্র শিখতে বলেছিলো।

কারও আর অবিশ্বাস হলো না। নিশ্চয় ডাইন হয়েছে মোংলা। তা না হলে ধাওড়ার লোকগুলার মধ্যে এত ঝাগড়া বিবাদ কেন, ছেলে বাপকে মানে না কেন, মেয়েগুলো পাপ করে কেন, পুরুষগুলো জুয়ায় বৌ বেটা বিকায় দেয় কেন!

হ্যাঁ, একটা কোনো পথ বের করতেই হবে, বলে পানা মান্‌কি। এভাবে কাটকম্ চারেচ দিয়ে খুঁটে খুঁটে কলিজা খেতে দিবে না তারা মোংলাকে।

পানা মান্‌কি বিচার দিলে, ওঝার কাছে গুনাতে হবে। খড়ি

দিয়ে গুনাতে হবে ডাইন বটে কি আর। তারপর টাঙি দিয়ে কাটে দিবো ওরে।

সবাই একমত হলো, হঁা গুনাতে হবে। ধাওড়ার সাঁওতাল পট্টিতে আছে দোখ্না ওঝা। তার কাছে ছুটলো সবাই। কেউ টাঙি নিয়ে, কেউ তীরধনুক নিয়ে।

খবর পৌঁছে গেলো ম্যানেজারের কাছেও।

কামরু গুরুর শিষ্য ওঝারা। দোখ্না ওঝাও মন্ত্র শিখেছে সেই কামরু গুরুর কাছে। খড়ি দেখতে জানে সে, চাল ছড়াতে জানে। লুণ্ডা করে, দেওতা খোঁড়ে, দেওতা ছাড়ায়। আর রোগ ভালো করে।

দোখ্না ওঝার কাছে এসে উচু হয়ে বসলো পানা মান্‌কি আর আকুম। পিছনে ধাওড়ার ভিড়।

বললে, মোংলা ডাইন কিনা গুনে দেখতে হবে। ডাইন না হলে রাঙিনাকে আসতে দেয় নি কেন সে আকুমের সঙ্গে। ডাইনী না হলে খ্রীষ্টান হলো কেন রাঙিনা, থাকে কেন পাদ্রীসাহেবের সঙ্গে।

দোখ্না ওঝা শুনলো সব। শুনে বললে, পাতা আনো, তেল আনো।

দুটো লোক ছুটলো শালপাতা আর তেল আনতে। একটু পরেই এসে হাজির হলো তারা।

দোখ্না ওঝা পাতা দুটোয় তেল মাখিয়ে ঘষতে ঘষতে মন্ত্র পড়তে শুরু করলো।

তেল তেল
রায়ে তেল
মান তেল
কুসুম তেল
ই তেল
পড়হায়েতে
কি উঠো
ডান উঠো
ভূত উঠো
যুগিন উঠো
বিষ উঠো

কে পড়ছে
গুরু পড়ছে
গুরু আজ্ঞা
মাত্রা পড়ছে।

মন্ত্র পড়া শেষ করে পাতা ছুটো একবার মাটিতে রাখলো দোখ্না ওঝা। তারপর পাতায় ঘর কাটলো। এখানে হলো ডান, এখানে দেওতা। এখানে বাইরের বোঙা, এখানে ছুখ, এখানে বিষ।

দোখ্না ওঝা হিসেব গুনতি করে মন্ত্র পড়ে বললে, হুঁ ডাইন উঠছে, ওড়ার নয়, জলের।

অর্থাৎ জলের ধারে ডাইনের বাস।

ঠিকই তো। পাদ্রীসাহেবের ডেরা মারাংগাড়ার ধারে। মোংলা থাকে সেইখানেই, জলের ধারে।

হৈ হৈ করে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো ওঁরাও মুণ্ডা সাঁওতাল সবাই।

পানা মান্‌কি বললে, ডাইনের বিচার লাগবে তা হলে। জানের কাছে বিচার লিতে হবে।

ওঝা শুধু গুনে বলে দিলেই তো কাজ হবে না, জান বিচার করবে ডাইনের।

কিন্তু জান কোথায় ধাওড়ার মধ্যে।

দোখ্না ওঝা বললে, জান আছে কুমাণ্ডিতে। লোক পাঠাও সেখানে। কিন্তু তার আগে গাছের ডাল কেটে এনে পুঁততে হবে ধাওড়ার সর্বত্র।

গাছের ডাল ভাঙতে শুরু করলো সকলে আর পানা মান্‌কির সঙ্গে আকুম চলে গেলো কুমাণ্ডির জানের কাছে।

সঙ্গে নিয়ে গেলো সুপারি ভাঁউনিচ, চাল, তেল, সিঁছুর, ধুনো আর বেলপাতা।

দিন দুই পরে ফিরে এলো পানা মানকি আর আকুম।

হ্যাঁ, তাদের চোখের সামনে ঘর কেটে চাল আর বেলপাতা রেখে গুনেছে জান। বুন্দা দাখিল করার পর নাকি বলেছে, একটা বাচ্চার কলিজা শুষে খাচ্ছে ডাইনটা। কে না জানে, আকুমের বাচ্চা ছেলেটার কলিজা মোংলার মুঠোয়। বলেছে, স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া বাধিয়েছে ডাইনী, বউটাকে পাপ করিয়েছে।

সব মিলে গেছে। ওঝার গুনতি আর জানের বিচার দুই বলেছে, মোংলা ডাইন।

শুনে চিৎকার করে উঠলো ধাওড়ার কুলিকামিনরা। পুরুষ-গুলো ছুটে এলো টাঙি নিয়ে, তীরধনুক নিয়ে। ক্ষেপে গেছে তারা। দিব্যি মানুষের মতো চেহারা নিয়ে ডাইনটা এতদিন ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের মধ্যে। কামিনগুলো ভয়ে কোলের বাচ্চাদের বুকের কাছে চেপে ধরলো।

তারপর দল বেঁধে ছুটতে ছুটতে চললো তারা পাদ্রীসাহেবের ডেরার দিকে। না, পাদ্রীসাহেবকে মারবে না তারা। পাদ্রীসাহেব লোক ভালো, ডাইন মোংলাটা মন্ত্র পড়ে সাহেবকেও খেয়ে নিয়েছে। যা খুশি করাচ্ছে তাকে দিয়ে।

ওদিকে ম্যানেজার সাহেবের কাছেও খবর পৌঁছে গেলো। খাদের কুলিকামিনগুলো নাকি রেগে গেছে পাদ্রীসাহেবের ওপর। টাঙি নিয়ে ছুটে চলেছে।

শুনেই বন্দুকটা কাঁধে ফেলে গীর্জার দিকে ছুটে গেলো ম্যানেজার সাহেব।

রবিবার। এতক্ষণে বোধ হয় খ্রীষ্টান মেয়েপুরুষরা গান গাইছে গীর্জায়।

দূর থেকে ম্যানেজার সাহেব দেখতে পেলো, কুলিকামিনের দল ছুটতে ছুটতে চলেছে ম্যাথুস সাহেবের ডেরার দিকে। আজ যে রবিবার তা খেয়াল হয়নি লোকগুলোর।

গীর্জায় এসেই ম্যাথুস সাহেবকে বাইরে ডাকলে ম্যানেজার। বললে খবরটা।

বললে, মোংলা আর রাঙিনাকে ওদের হাতে ছেড়ে দাও। রেগে গেলে ওরা বাঘের চেয়েও সাংঘাতিক।

শুনে হাসলো ম্যাথুস সাহেব। মোংলাকে ডাইন মনে করে খুন করতে চায় লোকগুলো, আর নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তাকে ঐ হিংস্র লোকগুলোর সামনে ছেড়ে দেবে ও?

—কক্ষনো না। আমি প্রাণ দিয়ে বাঁচাবো ওদের।

দেখতে দেখতে মোংলা আর রাঙিনাও শুনলো সব। ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে এসে পাদ্রীসাহেবের পা জড়িয়ে ধরলো মোংলা।—আমি ডাইন নই রে পাদ্রীসাহেব, মিছা কইছে, ডাইন নই আমি।

হাসলো ম্যাথুস সাহেব। বললে, ডর নাই তুয়ার। ডর নাই।

বলে গীর্জার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। পাশে বন্দুক উঁচিয়ে ধরলো ম্যানেজার সাহেব।

ইশারায় নিষেধ করলো ম্যাথুস। কিন্তু শুনলো না ম্যানেজার সাহেব।

এদিকে চিৎকার ভেসে আসছে, ক্রমশঃ কাছে আসছে লোকগুলো।

মারাংগাড়ার ডেরায় গিয়ে পাদ্রীসাহেবকে পায় নি তারা। আরও রেগে গেছে লোকগুলো। ছুটে আসছে গীর্জার দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়লো তারা। উল্লাসে চিৎকার করে পাদ্রীসাহেবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার পূর্বমুহূর্তেই চোখ পড়লো ম্যানেজার সাহেবের ওপর।

দেখলো বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ম্যানেজার সাহেব।

থমকে থেমে পড়লো তারা।

চিৎকার করে বললো, মোংলাকে দিয়ে দে। উ ডাইন বটে।

পাদ্রীসাহেব এগিয়ে এলো।—না।

—দিয়ে দে মোংলাকে, উ রাঙিনার কলিজা খায়ে লিয়েছে।

পাদ্রীসাহেব আরও এগিয়ে এলো। চিৎকার করে বললে, না।

রেগে গিয়ে তীর-ধনুক তুললো আকুম। টাঙি উঁচিয়ে হল্লা করে উঠলো অনেকে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ভয় পেয়ে ছুটে এলো মোংলা। এসে দাঁড়ালো পাদ্রীসাহেবের সামনে; পাদ্রীবাবাকে মারতে দেবে না সে, মারতে দেবে না।

কিন্তু আর আগেই আকুমের হাত থেকে বিষাক্ত তীর এসে বিঁধে গেছে মোংলার বুকে।

যন্ত্রণায় চিৎকার করে লুটিয়ে পড়লো মোংলা পাদ্রীসাহেবের পায়ের কাছে।

সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো সবাই। ডাইনটা মরেছে, ডাইনের আত্মাটা পালিয়েছে। আর ভয় নেই।

ছুটে এলো তারা মোংলার যন্ত্রণাকাতর দেহের কাছে। কিন্তু তার আগেই মোংলাকে কোলে তুলে নিয়েছে পাদ্রীসাহেব। ফিনকি দিয়ে রক্ত এসে লাগলো পাদ্রীসাহেবের ফুটফুটে সাদা আলখাল্লায়। রক্তে লাল হয়ে গেলো সাদা পোশাক।

এদিকে চিৎকার শুরু করলো কুলিকামিনরা। না, ওষুধ দিতে পাবে না, মোংলাকে সারাতে পারবে না পাদ্রীসাহেব।

টাঙি তুলে কে একজন চিৎকার করলো। আর সেই মুহূর্তে আওয়াজ হলো বন্দুকের।

ভয়ে আতঙ্কে চমকে উঠলো উন্মাদ লোকগুলো। এদিকে ওদিক তাকিয়ে দেখলো। না, কারও গায়ে লাগে নি ম্যানেজার সাহেবের গুলি। ফাঁকা আওয়াজ করেছে ম্যানেজার সাহেব।

অস্ফুট গুঞ্জন শুরু হলো আবার।

পানা মানকি ইশারা করলো, মানেজার সাহেবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে

তৈরী হলো সবাই। একটু একটু করে ম্যানেজার সাহেবের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করলো দলটা।

হয়তো ঝাঁপিয়েও পড়তো।

কিন্তু তার আগেই বিস্মিত হলো সকলে। রাঙিনা গীর্জার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। এক পা এক পা করে আকুমের দিকে এগিয়ে এলো সে! কোলে তার ছোট্টো শিশু।

সমস্ত হৈ-চৈ বন্ধ হয়ে গেলো। অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা। কেউ যেন কিছুই বুঝতে পারছে না।

আকুমের সামনে এসে দাঁড়ালো রাঙিনা।

বললে, ডাইন ছাড়ে দিছে আমায়, চ ওড়াকে চ।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে রাঙিনার দিকে তাকিয়ে রইলো আকুম। তারপর হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে ধাওড়ার দিকে হনহন করে হাঁটতে শুরু করলো। আর পিছনে পিছনে সমস্ত দলটা।

খুশি হয়ে উঠেছে সকলেই। ডাইন মরেছে, রাঙিনার কলিজাটাকে ছেড়ে দিয়েছে মোংলা।

একে একে সকলে চলে গেলো ধাওড়ার দিকে। শুধু আকুম আর রাঙিনা গেলো মারাংগাড়ায়।

মারাংগাড়ার জলে স্নান করে আকুম বললে, চ গোপীচাঁদ মুনশির কাছে, উ ওড়া দিবে কাম দিবে।

বেঁকে দাঁড়ালো আবার রাঙিনা।—না, যাবো নাই।

—ক্যানে।

একে একে সব খুলে বললো রাঙিনা। বললো, কেন সে যেতে চায় নি।

বললে, পাদ্রীসাহেবটা দেওতা বটে রে আকুম, মোংলাটা মানুষ ভালো বটে। ডাইন লয় উ।

বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকালো আকুম। বলে কি রাঙিনা?

সব ভুল ? মোংলা ডাইন নয় ? ওঝার খাড়ি ঠিক নয় ? জানের বিচার ঠিক নয় ?

না, সব ভুল।

মোংলার কথা মনে হতেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো আকুম। উ মেয়েটাকে মিছামিছি মারলাম আমরা ? উ ডাইন নয় ?

—না মোংলা ডাইন নয়। হাসলো রাঙিনা। ডাইন উ খাদানটা, ডাইন উ খাদানের মুনশি আর বাবুরা।

সত্যিই বুঝি তাই। ঐ খাদটাতেই যত বিষ, বাবু আর মুনশিরাই যত বিষ ছড়ায়।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো আকুম। তারপর বললে, না, খাদানে যাবো নাই আর। চল, লাপরার গাঁওকে ফিরা যাই।

—যাবি !

—হুঁ, যাবো লাপরার গাঁওকে। তোর বুড়া বাপটার কাছে যাবো চ।

খুশি হয়ে উঠলো রাঙিনা। তারপর দ্রুত পা ফেলতে ফেলতে গাঁয়ের দিকে ফিরে চললো দু-জনে।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে তখন। যতদূর চোখ যায় শুধু বন আর বন। মাঝে মাঝে পাহাড়ের ঢেউ। ক্রমশঃ অন্ধকার ঘন হয়ে নেমে আসছে বনের মাথায়।

আলো নেই, আগুন নেই। আগের মতো আর তুমদা মাদলের আওয়াজ আসে না, বাঁশির সুর বাজে না তিরিরিরি তিরিরিরি। গান ভেসে আসে না লাপরার গাঁ থেকে।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো রাঙিনা। বললে, ওঁরাও আর মুণ্ডা, সাঁওতাল আর জুয়াং, বাবুরা আর মুনশিরা আর সাহেবরা উ সব মানুষগুলাই এক রে আকুম, সব মানুষগুলাই এক।

আকুম হেসে বললে, পাদ্রীসাহেবটা ভালো বটে, মোংলাটা ভালো বটে।

রাঙিনা বললে, সব মানুষগুলাই ভালো বটে, সব মানুষগুলাই মন্দ বটে।

হো-হো করে হেসে উঠলো আকুম। এ আবার কি কথা? সব মানুগুলোই ভালো, সব মানুষগুলোই খারাপ?

রাঙিনা হেসে বললে, হাঁ রে, মিছা লয়। পাদ্রীসাহেব কয়েছে সব মানুষগুলাই ভালো বটে, আর লতুন মুনশিটা কয়েছে সব মানুষগুলাই খারাপ বটে। দু-টাই ঠিক কথা।

আকুম শুধু বললে, হুঁ।

বলে সামনের পথটার দিকে তাকালে। উঃ, সংঘাতিক অন্ধকার সামনের পথটা। সমস্ত পৃথিবীটা যেন অন্ধকারে ঢেকে গেছে।

আকুম হঠাৎ আবার থেমে দাঁড়ালো।

তারপর বললে, গাঁও দেহাতটা মাটি বটে, খাদানটাও মাটি বটে।

—হুঁ।

—মাটি তো মা বটে আমারদের। তো খাদানটা বিষ হবে?

তাই তো। চাষের মাটি আর খাদের মাটি—দু-ই তো মা। তবে খাদটা বিষ হবে কেন?

আকুম হঠাৎ হেসে বললে, আঁধার বটে গাঁও দেহাতের সড়কটা।

সত্যিই তাই, ঘন অন্ধকার গ্রামের পথটা।

—হুঁ।

ফিরে দাঁড়ালো আকুম।—ছাখ ক্যানে, ছাখ ক্যানে খাদানটা।

রাঙিনাও ফিরে দাঁড়ালো।

দূরের খাদ আর বাংলো পাড়ায় সারি সারি ইলেকট্রিকের আলো জ্বলছে, ঝলমল করছে চারিদিক।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আকুম হেসে উঠে বললে, চ উ মাটির কাছেই যাই ক্যানে।

রাঙিনাও হাসলো।—হুঁ, আলো আছে, মাটির মুখে হাসি আছে। বলে হনহন করে দুজনেই খাদের পথে ফিরতে শুরু করলো। দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে আকুম হঠাৎ বললে, জলদি। উদের বলতে হবে মোংলা ডাইন নয়, ডাইন নাই।

॥ প্রথম পর্ব সমাপ্ত ॥